আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?

(উৎসর্গ: গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী - আত্মায় অবিশ্বাসী একজন পরিপূর্ণ ইহজাগতিক মানুষ)

অভিজিৎ রায়

আত্মার উৎস সন্ধানে :

আত্মার ধারণা অনেক পুরোন। যখন থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েছে, নিজের জীবন নিয়ে কিংবা মৃত্যু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, জীবন জগতের বিভিন্ন রহস্যে হয়েছে উদ্বেলিত, তার ক্রমিক পরিনতি হিসেবেই এক সময় মানব মনে আত্মার ধারণা উঠে এসেছে। আসলে জীবিত প্রাণ থেকে জড়জগৎকে পৃথক করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সমাধান হিসেবে আত্মার ধারণা একটা সময় গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়[১, ৪, ৫, ১৯]। আদিকাল থেকেই মানুষ ইট, কাঠ, পাথর যেমনি দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে চারপাশের বর্ণাঢ্য জীবজগতকে। ইট, পাথর বা অন্যান্য জড় পদার্থের যে জীবনীশক্তি নেই, নেই কোন চিন্তা করার ক্ষমতা তা বুঝতে তার সময় লাগেনি। অবাক বিস্ময়ে সে ভেবেছে - তাহলে জীবগতের যে চিন্তা করার কিংবা চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতাটি রয়েছে, তার জন্য নিশ্চয় বাইরে থেকে কোন আলাদা উপাদান যোগ করতে হয়েছে। আত্মা নামক অপার্থিব উপাদানটিই সে শুন্যস্থান তাদের জন্য পূরণ করেছে[১৪], তারা রাতারাতি পেয়ে গেছে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার খুব সহজ একটা সমাধান। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আত্মা দিয়ে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার করার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিলো সম্ভবতঃ নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে[১৯]। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মাচরণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় অনেক সরল। ইরাকের শানিদার নামের একটি গুহায় নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে যা দেখে অনুমান করা যায় যে, নিয়ান্ডার্থালরা প্রিয়জন মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করতো। এমনকি তারা মৃতদেহ কবর দেয়ার সময় এর সাথে পুষ্পরেণু, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্র সামগ্রী, শিয়ালের দাঁত এমনকি মাদুলীসহ সব কিছুই দিয়ে দিত যাতে পরপারে তাদের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে আর সঙ্গে আনা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারে। অনেক গবেষক (যেমন নিলসন গেসছিটি, রবার্ট হার্টস প্রমুখ) মনে করেন, মৃতদেহ নিয়ে আদি মানুষের পারলৌকিক ধর্মাচরণের ফলশ্রুতিতেই মানব সমাজে ধীরে ধীরে আত্মার উদ্ভব ঘটেছে[১৬]।

আত্মা নিয়ে হরেক রকম গপ্প:

জীবন মৃত্যুর যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে আত্মাকে ‘আবিস্কার’ করলেও সেই আত্মা কি করে একটি জীবদেহে

প্রাণসঞ্চার করে কিংবা চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা নিয়ে প্রাচীন মানুষেরা একমত হতে পারেনি। ফলে জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের গাল গপ্প, লোককথা আর উপকথার। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ হয়েছে নানা ধরনের ধর্মীয় কাহিনীর। জন্ম হয়েছে আধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদের, তারপর সেগুলো সময়ের সাথে সাথে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিলে মিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে আত্মা ছাড়া জীবন-মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করাই অনেকের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আত্মা নিয়ে কিছু মজার কাহিনী এবারে শোনা যাক।

জাপানীরা বিশ্বাস করে একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ভেতরের আত্মা খুব ছোট পতঙ্গের আকার ধারণ করে তার হা করা মুখ দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তারপর যখন ওই আত্মা নামক পোকাটি ঘুরে ফিরে আবার হামগুড়ি দিয়ে মুখ বেয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তখনই ওই মানুষটি ঘুম থেকে জেগে উঠে[১, ৪]। মৃত্যুর ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে খুব সহজ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোকাটি আর যদি কোন কারণে ফেলে আসা দেহে ঢুকতে বা ফিরতে না পারে, তবে লোকটির মৃত্যু হয়। অনেক সময় ঘুমন্ত মানুষের অস্বাভাবিক স্বপ্নদেখাকেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন প্রাচীন মানুষেরা[১৫, ১৬]। তারা ভাবতেন, ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের আত্মা 'স্বপ্নের দেশে' পাড়ি জমায়। আর তারপর স্বপ্নের দেশ থেকে আবার ঘুমন্ত মানুষের দেহে আত্মা ফেরত এলে মানুষটি ঘুম থেকে জেগে উঠে। আত্মা নিয়ে এধরনের নানা বিশ্বাস আর লোককথা ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিল।

আত্মার এক ধরণের প্রাগৈতিহাসিক ধারণা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অ্যাবরোজিনসদের মধ্যে প্রচলিত ছিল[৭]। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে অ্যাবরোজিনসরা অস্ট্রেলিয়ার মূল ভুখন্ডে আসার পর অনেকদিন বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে তাদের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল চারপাশের পৃথিবী থেকে একটু ভিন্নভাবে। তাদের আত্মার ধারণাও ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে ভিন্ন রকেমের। তাদের আত্মা ছিল যোদ্ধা প্রকৃতির। তীর-ধনুকের বদলে বুমেরাং ব্যবহার করত। কোন কোন অ্যাবরোজিন এও বিশ্বাস করত যে, তাদের গোত্রের নতুন সদস্যরা আত্মাদের পুনরায় ব্যবহার করতে পারত। ঠিক একইভাবে প্রায় বার হাজার বছর আগেকার আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যেও আত্মা নিয়ে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যা প্রকারন্তরে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার অভিযোজনকেই তুলে ধরে। আফ্রিকার কালোমানুষদের মতে সকল মানুষের আত্মার রং কালো রং-এর। আবার মালয়ের বহু মানুষের ধারণা, আত্মার রঙ রক্তের মতই লাল, আর আয়তনে ভুট্টার দানার মত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা আত্মা আসলে তরল। অস্ট্রেলিয়ার অনেকে আবার মনে করে আত্মা থাকে বুকের ভিতরে, হৃদয়ের গভীরে; আয়তনে অবশ্যই খুবই ছোট[২১]। কাজেই এটুকু বলা যায়, আত্মায় বিশ্বাসীরা নিজেরাই আত্মার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত নন। আত্মা নিয়ে প্রচলিত পরস্পর-বিরোধী গাল-গপ্পগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, হিব্রু, পারশিয়ান আর গ্রীকদের মধ্যে আত্মা নিয়ে বহুধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে - অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতক পর্যন্ত তো বটেই- হিব্রু, ফোয়েনিকানস আর ব্যবলনীয়, গ্রীক এবং রোমাদের মধ্যে মৃত্যু-পরবর্তী আত্মার কোন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি[১, ৪]। তারা ভাবতেন মানুষের আত্মা একধরনের সজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ (shadowy entity) অসম্পূর্ণ সত্তা, পূর্ণাংগ কিছু নয়। গবেষক ব্রেমার আত্মা নিয়ে প্রাচীন ধারণাগুলো সম্বন্ধে বলেন, 'মোটের উপর আত্মাগুলো ছিল চেতনাবিহীন ছায়া ছায়া জিনিস, পূর্ণাংগ সত্তা তৈরি করার মত গুণাবলীর অভাব ছিল তাতে'[১৬]।

সম্ভবতঃ জরথ্রুস্ট্র ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার আত্মা সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা আধুনিক আধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া আত্মার ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। জরথ্রুস্ট্র ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগেকার একজন পারশিয়ান। তার মতানুযায়ী, প্রতিটি মানুষ তৈরি হয় দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে, এবং আত্মার কল্যানেই আমরা যুক্তি, বোধ, সচেতনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে পারি। জরথ্রুস্ট্রবাদীদের মতে, প্রতিটি মানুষই নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম করার অধিকারী, এবং সে অনুযায়ী, তার ভাল কাজ কিংবা মন্দকাজের উপর ভিত্তি করে তার আত্মাকে পুরষ্কৃত করা হবে কিংবা শাস্তি প্রদান করা হবে। জরথ্রুস্ট্রের দেওয়া আত্মার ধারণাই পরবর্তীকালে গ্রীক এথেনীয় দার্শনিকেরা এবং আরো পরে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম তাদের দর্শনের অংগীভুত করে নেয়। খ্রীষ্টধর্মে আত্মার ধারণা গড়ে ওঠে সেন্ট অগাস্টিনের হাতে। জরথ্রুস্ট্রের মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মবেত্তা সেন্ট অগাস্টিন খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে একই ধরণের (মানুষ = দেহ + আত্মা) যুক্তির অবতারণা করেন। এই ধারণাই পরবর্তিতে অস্তিত্বের দৈত্বতা (dulaliy) হিসবে খ্রীষ্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এর সাথে যোগ হয় পাপ-পূণ্য এবং পরকালে আত্মার স্বর্গবাস বা নরকবাসের হরেকরকেরম গালগপ্প। এগুলোই পরে ডালপালায় পল্লবিত হয়ে পরে ইসলাম ধর্মেও স্থান করে নেয়। সন্দেহ করা হয়, প্রাথমিকভাবে অগাস্টিন জরথ্রুস্ট্রবাদীদের কাছ থেকেই আত্মার ধারণা পেয়েছিলেন, কারণ খ্রীষ্টধর্মগ্রহন করার আগ পর্যন্ত নয় বছর অগাস্টিন ম্যানিকিন (Manchean) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে জরথ্রুস্ট্রবাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল পুরোমাত্রায়।

হিব্রু এবং গ্রীকদের মধ্যে প্রথম দিকে আত্মা নিয়ে কোন সংহত ধারণা ছিল না । এই অসংহত ধারণার প্রকাশ পাওয়া যায় হোমারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫০) রচনায় - *সাইকি* (Psyche) শব্দটির উল্লেখে। হোমারের বর্ণনানুযায়ী, কোন লোক মারা গেলে বা অচেতন হয়ে পরলে 'সাইকি' তার দেহ থেকে চলে যায়[১৬]। তবে সেই সাইকির সাথে আজকের দিনে প্রচলিত আত্মার ধারণার পার্থক্য অনেক। হোমারের সাইকি ছিল সজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ অসম্পূর্ণ সত্তা; এর আবেগ, অনুভূতি কিংবা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না [১, ৪]। ছিল না পরকালে আত্মার পাপ-পূণ্যের হিসাব।

এর মাঝে গ্রীসের অয়োনীয় যুগের বিজ্ঞানীরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবণ মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন। ভাববাদের কচকচানি এড়িয়ে প্রথম যে গ্রীক দার্শনিক জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হলেন, তাঁর নাম থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রী.পূ.)। থেলিসের বক্তব্য ছিল, বস্তু মাত্রই প্রাণের সুপ্ত আধার। উপযুক্ত পরিবেশে বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রাণ আত্মপ্রকাশ করে[২০]। পরমাণু তত্ত্বের প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রী.পূ.) প্রাণের সাথে বস্তুর নৈকট্যকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ডেমোক্রিটাস বলতেন, সমগ্র বস্তুজগৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। তিনি সে কণিকাগুলোর নাম দিলেন অ্যাটম বা পরমাণু। তিনি শুধু সেখানেই থেমে থাকেননি, তার পরমাণু তত্ত্বকে নিয়ে গেছেন প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেও। তিনি বলতেন, কাদা মাটি বা আবর্জনা থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় তখন অজৈব পদার্থের অনুগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত হয়ে জীবনের ভিত্তিভুমি তৈরি করে। ডেমোক্রিটাসের প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক লিউসেপ্পাসও (আনুমানিক ৫০০-৪৪০ খ্রী.পূ.) এধরণের বস্তুবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বিজ্ঞানে তিনটি নতুন ধারণা চালু করেন -চরম শূন্যতা, চরম শূন্যতার মধ্য দিয়ে এটমের চলাফেরা এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন। লিউসেপ্পাসই প্রথম

বিজ্ঞানে কার্যকারণ তত্ত্বের জন্ম দেন বলে কথিত আছে [২২] । অয়োনীয় যুগের দর্শনের বস্তুবাদীরূপটিকে পরবর্তীতে আরো উন্নয়ন ঘটান এপিকিউরাস এবং লুক্রেশিয়াস, এবং তা দর্শন ও নীতিশাস্ত্রকেও প্রভাবিত করে। গ্রীক পরমাণুবাদ পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, প্রথম আধুনিক পরমাণুবিদ গ্যাসেন্ডি তার পরমাণুবাদ তৈরির জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন ডেমোক্রিটাস এবং এপিকিউরাসের কাছে। গ্রীক পরমানূবাদ প্রভাবিত করেছিল পরবর্তীতে পদার্থবিদ নিউটন এবং রসায়নবিদ জন ড্যাল্টনকেও তাদের নিজ নিজ পরমাণু তত্ত্ব নির্মাণে।

কাজেই গ্রীসের অয়োনীয় যুগে মেইনস্ট্রীম দার্শিনিকদের চিন্তা চেতনা ছিল অনেকটাই বস্তুবাদী। কিন্তু পরে পারস্য দেশের প্রভাবে আত্মা সংক্রান্ত সব আধ্যাতিক এবং ভাববাদী ধ্যান-ধারনা গ্রীকদের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাববাদী দর্শনের তিন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। এরা এথেন্সের সন্তান হলেও সে এথেন্স তখন অবক্ষয়ী এথেন্স। তারপরও পরবর্তী আড়াই হাজার বছর তাদের চিন্তা-চেতনা দিয়ে মানব সমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। এদের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ব থেকে তারা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার মত শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ক্ষমতাকে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতেন [২২] । তারা গণতন্ত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন এবং গণতন্ত্রের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। অয়োনীয় যুগের দার্শনিকেরা পলে পলে বস্তুবাদের যে সৌধ গড়ে তুলেছিলেন, তা এই তিন ভাববাদী দার্শনিকদের আগ্রাসনে বিলুপ্ত হয়। বস্তুবাদকে সরিয়ে মূলতঃ রহস্যবাদী উপাদানকে হাজির করে তারা তাদের দর্শন গড়ে তুলেন। প্লেটোর বক্তব্য ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র যখন আত্মা প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এ সমস্ত তত্ত্বকথাই পরবর্তীতে খ্রীস্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দেয়। প্লেটোর এই ভাববাদী তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে পরবর্তীতে হাজারখানেক বছর রাজত্ব করে। এখন প্রায় সব ধর্মমতই দার্শনিক-যুগলের ভাববাদী ধারণার সাথে সঙ্গতি বিধান করে। আত্মা সংক্রান্ত কুসংস্কার শেষপর্যন্ত মানব সমাজে ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসে।

আত্মার অসারতা :

জীব কী আর জড় কী? বুঝব কি করে কে জীব আর কে জড়? জীবিতদের কি ভাবে সনাক্ত করা যায়? একটি মৃতদেহ আর একটি জীবিত দেহের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? এ প্রশ্নগুলো দিয়ে আগেকার দিনের মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ই আন্দোলিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা শেষপর্যন্ত কল্পনা করে নিয়েছে অদৃশ্য আত্মার [১৯]। ভেবেছে আত্মাই বুঝি জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের ভাববাদী ধ্যানধারণাগুলো কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন ধর্মে জায়গা করে নেওয়ার পর জীবন-মৃত্যুর সংজ্ঞা ধর্মীয় মিথের আবরণে পাখা মেলতে শুরু করল। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করল, ঈশ্বরের নির্দেশে আজরাইল বা যমদূত এসে প্রাণহরণ করলেই কেবল একটি মানুষ মারা যায়। আর তখন তার দেহস্থিত আত্মা পাড়ি জমায় পরলোকে। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এ ধরনের ভাববাদী

চিন্তা জন্ম দিয়েছে আধ্যাত্মবাদের। আধ্যাত্মবাদ স্বতঃপ্রমাণ হিসেবেই ধরে নেয়-'আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।' মজার ব্যাপার হল, একদিকে যেমন আত্মাকে অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। ধর্মগ্রন্থগুলি ঘাটলেই এ ধরনের স্ববিরোধিতার হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে মানুষ। কারণ সে সময় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল সীমিত। মৃত্যুর সঠিক কারণ ছিল তাদের জানার বাইরে। সেজন্য অনেক ধর্মবাদীরাই 'আত্মা' কিংবা 'মন' কে জীবনের আধাররূপী বস্তু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন, ইসলামিক মিথ্ বলছে, আল্লাহ মানবজাতির সকল আত্মা একটি নির্দিষ্ট দিনে তৈরী করে বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (ইল্লিন) বন্দি করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য একেকটি আত্মাকে তুলে নিয়ে মর্তে পাঠানো হয়। আবার আচার্য শঙ্কর তার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, 'মন হল আত্মার উপাধি স্বরূপ'। ওদিকে আবার সাংখ্যদর্শনের মতে - 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ' (সাংখ্যসুত্র ৫/৬৯)। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, 'চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম।' (ষড়দর্শন সমুচ্চয়, পৃঃ ৫০) স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবতেন, 'চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা।' (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ১৬২) স্বামী অভেদানন্দের মতে, 'আত্মা বা মন মস্তিস্ক বহির্ভুত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।' (মরণের পারে, পৃঃ ৯৮)। গ্রীক দর্শনেও আমরা প্রায় একই রকম ভাববাদী দর্শনের ছায়া দেখতে পাই, যা আগের অংশে আমারা আলোচনা করেছি। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রসারিত করে পরবর্তী যুগের চাহিদার উপযোগী করে তোলেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে নয়া প্লেটোবাদীরা 'ঈশ্বর অজৈব বস্তুর মধ্যে জীবন সৃষ্টিকারী আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে জীবন দান করেন' - এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। নয়া প্লেটোবাদী প্লাটিনাসের মতে, 'জীবনদায়ী শক্তিই জীবনের মূল।' বস্তুতপক্ষে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'জীবনশক্তি' (life force) তত্ত্ব এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে এবং জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিও জোরালো হয়। ধর্মবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, ভয় সব কিছু মিলে শিক্ষিত সমাজে এই ভাববাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর যুক্তির প্রসারের ফলে আজ কিন্তু আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ছে। যদি জীবনকে 'আত্মার উপস্থিতি' আর মৃত্যুকে 'আত্মার দেহত্যাগ' দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তো যে কোন জীবিত সত্ত্বারই - তা সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক- আত্মা থাকা উচিৎ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেহে কি কেবল একটিমাত্র আত্মা থাকবে নাকি একাধিক? যেমন, বেশ কিছু উদ্ভিদ - গোলাপ, কলা, ঘাসফুল এমন কি হাইড্রা, কোরালের মত প্রাণীরাও কর্তন (Cut) ও অঙ্কুরোদগোমের (Bud) মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। তাহলে কি সাথে সাথে আত্মাও কর্তিত হয়, নাকি একাধিক আত্মা সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয়? আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে, পানিতে ডুবে যাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ, মৃত বলে মনে হওয়া/ঘোষিত হওয়া অচেতন ব্যক্তির জ্ঞান চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় - তখন কি দেহত্যাগী বৈরাগী আত্মাকেও সেই সাথে ডেকে ঘরে থুড়ি দেহে ফিরিয়ে আনা হয়? প্রজননকালে পিতৃদত্ত শুক্রানু আর মাতৃদত্ত ডিম্বানুর মিলনে শিশুর দেহকোষ তৈরী হয়। শুক্রানু আর ডিম্বানু জীবনের মূল, তাহলে নিশ্চয় তাদের আত্মাও আছে। এদের আত্মা কি তাদের

আভিভাবকদের আত্মা থেকে আলাদা? যদি তাই হয় তবে কিভাবে দুটি পৃথক আত্মা পরস্পর মিলিত হয়ে শিশুর দেহে একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মার জন্ম দিতে পারে? মানব মনের এ ধরনের অসংখ্য যৌক্তিক প্রশ্ন আত্মার অসারত্বকেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে।

আত্মার সংজ্ঞাতেও আছে বিস্তর গোলমাল। কেউ আত্মার চেহারা বায়বীয় ভাবলেও (স্বামী অভেদানন্দের মরণের পারে দ্রঃ) কেউ আবার ভাবেন তরল (প্রশান্ত মহাসাগরের অধিবাসী); কেউ আত্মার রঙ লাল (মালয়ের অধিবাসী) ভাবলেও অন্য অনেকে ভাবেন কালো (আফ্রিকাবাসী এবং জাপানীদের অনেকের এ ধরণের বিশ্বাস রয়েছে)। বিদেহী আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে গোলমাল আরো বেশি। বিশ্বের প্রধান ধর্মমত হিসেবে হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের কথা আলোচনা করা যাক। হিন্দুরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে; আবার অপরদিকে মুসলিম আর খ্রীষ্টানদের কাছে আত্মার পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে বলেন [২১],

> 'একবার ভাবুন তো, আত্মার চেহারাটা কেমন, তাই নিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন মত। অথচ স্বামী অভেদানন্দই এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, সত্য কখনো দু'রকমের বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখন্ড।'

বিবর্তনতত্ত্ব মানতে গেলে তো আত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্মকে ভালমতই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে জড় থেকেই জীবের উদ্ভব ঘটেছিল পৃথিবীর বিশেষ ভৌত অবস্থায় নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে আর তারপর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে জৈববিবর্তনের বন্ধুর পথে। এই প্রাণের উদ্ভব এবং পরে প্রজাতির উদ্ভবের পেছনে কোন মন বা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণের উদ্ভবের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, আর আধুনিক মানুষ তো এল -এই সেদিন - মাত্র পচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে ত্রিশ বছর আগে মানুষের আত্মারা কোথায় ছিল? জীবজন্তু কিংবা কীটপতঙ্গ হয়ে? কোন পাপে তাহলে আত্মারা কীটপতঙ্গ হল? পূর্বজন্মের কোন কর্মফলে এমনটি হল? পূর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পেছাতে থাকলে যে প্রাণীতে আত্মার প্রথম জন্মটি হয়েছিল সেটি কবে হয়েছিল? হলে নিশ্চয়ই এককোষী সরল প্রাণ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিল। এককোষী প্রাণের জন্ম হয়েছিল কোন জন্মের কর্মফলে?

বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্ব না জানা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী চার্বাকেরা সেই খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তাদের সেসময়কার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছিলেন। আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ চার্বাকদের লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আত্মাই যদি না থাকবে তবে কেন অযথা স্বর্গ নরকের কেচ্ছা-কাহিনীর আমদানী। আত্মা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট কাটা চার্বাকেরা ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক-জাতিভেদ-জন্মান্তর সব কিছুকেই তারা নাকচ করে দেন। তারাই প্রথম বলেছিলেন বেদ 'অপৌরুষেয়' নয়, এটা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষেরই রচিত। জনমানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সেই সব স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের চার্বাকেরা ভন্ড, ধূর্ত, চোর, নিশাচর বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা বাতিল করে দিয়েছিলেন আত্মার অস্তিত্ব, উন্মোচন করেছিলেন ধর্মের জুয়াচুরি এই বলে :

> ‘বেহেস্ত ও মোক্ষপ্রাপ্তি কি পরিত্রাণলাভ ফাঁকা অর্থহীন অসার বুলিমাত্র, উদরযন্ত্রে বিসর্পের কারণে সবেগে উৎক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় ঢেকুরমাত্র। এসব প্যাক প্যাক বা বাকচাতুরি নৈতিক অপরাধ, উন্মার্গ গমন, মানসিক ও দৈহিক ঔদার্যের ফলশ্রুতি -পরান্নভোজী বমনপ্রবণ ব্যক্তিদের অদম্য কুৎসিৎ বমনমাত্র, পেটুকদের এবং উন্মার্গগামীদের বিলাস-কল্পণা। পরজগতে যাওয়ার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমের নির্দিষ্ট মেকি নিয়ম-আচার আসলে কোন ফল উৎপন্ন করে না। বর্ণাশ্রমের শেষ পরিনামের কাহিনী সাধারণ মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে গাঁজাবার খামি বিশেষ।’

চার্বাকেরা বলতেন, চতুর পুরোহিতদের দাবী অনুযায়ী যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলিকৃত প্রাণী সরাসরি স্বর্গলাভ করে, তাহলে তারা নিজেদের পিতাকে এভাবে বলি দেয় না কেন? কেন তারা এভাবে তাদের পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে না? :

যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে
তবে পিতাকে পাঠতে স্বর্গে
ধরে বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।

চার্বাকেরা আরো বলতেন :

‘চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা
তবে ত পিন্ডদান নেহাতই বৃথা।’

কিংবা

যদি শ্রাদ্ধকর্ম হয় মৃতের তৃপ্তের কারণ
তবে নেভা প্রদীপে দিলে তেল, উচিৎ জ্বলন।

আত্মা বা চৈতন্যকে চার্বাকেরা তাদের দর্শনে আলাদা কিছু নয় বরং দেহধর্ম বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ব্যাপারটা এখন আধুনিক বিজ্ঞানও সমর্থন করে। পানির সিক্ততার ব্যাপারটা চিন্তা করুন। এই সিক্ততা জিনিসটা আলাদা কিছু নয় - বরং পানির অনুরই স্বভাব ধর্ম। 'সিক্তাত্মা' নামে কোন অপার্থিব সত্ত্বা কিন্তু পানির মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়ে তাতে সিক্ততা নামক ধর্মটির জাগরণ ঘটাচ্ছে না। বরং পানির অণুর অঙ্গসজ্জার কারণেই 'সিক্ত'তা নামের ব্যাপারটির অভ্যুদয় ঘটছে। চার্বাকেরা বলতেন, মানুষের চৈতন্য বা আত্মাও তাই। দেহের স্বভাব ধর্ম হিসেবেই আত্মা বা চৈতন্যের উদয় ঘটছে। কিভাবে এর অভ্যুদয় ঘটে? চার্বাকেরা একটি চমৎকার উপমা দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আঙ্গুর এবং মদ তৈরির অন্যান্য উপাদানগুলোতে আলাদা করে কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোই এক ধরণের বিশেষ প্রক্রিয়ায়র মাধ্যমে কোন পাত্রে মিলিত করার পরে এর একটি নতুন গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও তেমনি। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা এভাবেই তাদের ভাষায় 'রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়' প্রাণের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কোন রকমের আত্মার অনুকল্প ছাড়াই। তাদের এই বক্তব্যই পরবর্তীতে ভাববাদী দার্শনিকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আত্মা, মন এবং অমরত্ব : বিজ্ঞানের চোখে

ভাববাদীরা যাই বলুক না কেন স্কুলের পাঠ শেষ করা ছাত্রটিও আজ জানে, মন কোন 'বস্তু' নয়; বরং মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কাজ কর্মের ফল। চোখের কাজ যেমন দেখা, কানের কাজ যেমন শ্রবণ করা, পাকস্থলীর কাজ যেমন খাদ্য হজম করা, তেমনি মস্তিস্ক কোষের কাজ হল চিন্তা করা। তাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেন [২]: 'বিস্ময়কর অনুকল্পটি হল: আমার 'আমিত্ব', আমার উচ্ছ্বাস, বেদনা, স্মৃতি, আকাংখা, আমার সংবেদনশীলতা, আমার পরিচয় এবং আমার মুক্তবুদ্ধি এগুলো আসলে মস্তিস্কের স্নায়ুকোষ এবং তাদের আনুষঙ্গিক অণুগুলোর বিবিধ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।' মানুষ চিন্তা করতে পারে বলেই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মত করে সাজাতে পারে, সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে কল্পণা করতে পারে তার ভিতরে 'মন' বলে সত্যই কোন পদার্থ আছে, অথবা আছে অদৃশ্য কোন আত্মার আশরীরী উপস্থিতি। মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ। আসলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু মানেই কিন্তু 'মন' এর মৃত্যু, সেই সাথে মৃত্যু তথাকথিত আত্মার। অনেক সময় দেখা যায় দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ঠিকমত কর্মক্ষম আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। এ ধরনের অবস্থাকে বলে কোমা। মানুষের চেতনা তখন লুপ্ত হয়। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে জীবিত দেহ তখন অনেকটা জড়পদার্থের মতই আচরণ করে। তাহলে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্রটি রক্ষা করছে কে? এ কি অশরীরী আত্মা, নাকি মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সঠিক কর্মক্ষমতা?

এ পর্যায়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার রমণ লাম্বার মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করা যাক। ১৯৯৮ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) লীগের খেলা চলাকালীন সময় মেহেরাব হোসেন অপির একটি পুল শট

ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিংরত লাম্বার মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয় নি। নিজেই হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারালেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন। পরদিন ২১ এ ফেব্রুয়ারী তাকে পিজি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হল। সেখানে তার অপারেশন হল, কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। পরদিন ২২ এ ফেব্রুয়ারী ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন যে, মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুসের কাজ চলছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারী বিকেল সাড়ে তিনটায় তার আইরিশ স্ত্রী কিমের উপস্থিতিতে হার্ট লাং মেশিন বন্ধ করে দিলেন চিকিৎসকেরা। থেমে গেল লাম্বার হৃৎস্পন্দন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ কোনটি হওয়া উচিৎ? ২২ নাকি ২৩ ফেব্রুয়ারী? আর তার মৃত্যুক্ষণটি নির্ধারণ করলেন কারা? আজরাইল/যমদূত নাকি চিকিৎসারত ডাক্তারেরা?

এ ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বুঝতে হলে মৃত্যু নিয়ে দু'চার কথা বলতেই হবে। জীবনের অনিবর্তনীয় পরিসমাপ্তিকে (Irreversible cessation of life) বলে মৃত্যু। কেন জীবের মৃত্যু হয়? কারণ মৃত্যুবরণের মাধ্যমে আমাদের জীবন তাপগতীয় স্থিতাবস্থা (thermodynamic equilibrium) প্রাপ্ত হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মানতে গেলে জীবনের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় - নিবিষ্টচিত্তে এন্ট্রপি বাড়িয়ে চলা। আমাদের খাওয়া, দাওয়া, শয়ন, ভ্রমণ, মৈথুন, কিংবা রবিঠাকুরের কবিতা পাঠের আনন্দ - সব কিছুর পেছনেই থাকে মোটা দাগে কেবল একটি মাত্র উদ্দেশ্য - ফেইথফুলি এনট্রপি বাড়ানো - সেটা আমরা বুঝতে পারি আর নাই পারি! জন্মের পর থেকে সারা জীবন ধরে আমরা এনট্রপি বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রকৃতিতে তাপগতীয় অসাম্য তৈরি করি, আর শেষ মেষ পঞ্চত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে অন্যান্য জড় পদার্থের মত নিজেদের দেহকে তাপগতীয় স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসি। কিন্তু কিভাবে এই স্থিতাবস্থার নির্দেশ আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি? জীবিবিজ্ঞানের চোখে দেখলে, আমরা (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যারা যৌনসংযোগের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে প্রকৃতিতে টিকে রয়েছে তাদের থেকে মরণ জিন (Death Gene) প্রাপ্ত হয়েছি এবং বহন করে চলেছি। এই ধরনের জিন (মরণ জিন) তার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পিত উপায়েই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। যৌনজননের মাধ্যমে বংশবিস্তাররের ব্যাপারটিতে আমি এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, যে সমস্ত প্রজাতি যৌনজননকে বংশবিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের 'মৃত্যু' নামক ব্যাপারটিকেও তার জীবগত বৈশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। দেখা গেছে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে সেক্স-সেল বা যৌনকোষগুলোই (জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'জার্মপ্লাজম') হচ্ছে একমাত্র কোষ যারা সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিজেদের জিন সঞ্চারিত করে টিকে থাকে। জীবনের এই অংশটি অমর। কিন্তু সে তুলনায় সোমাটিক সেল দিয়ে তৈরী দেহকোষগুলো হয় স্বল্পায়ুর। অনেকে এই ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন 'প্রোগ্রামড্ ডেথ'। এ যেন অনেকটা বেহুলা-লক্ষিন্দর কিংবা বাবর-হুমায়ূনের মত ব্যাপার-স্যাপার - জননকোষের অমরত্বকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে দেহকোষকে বরণ করে নিতে হয়েছে মৃত্যুভাগ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স হালকাচালে তার 'সেলফিশ জিন' বইয়ে বলেছেন, 'মৃত্যু'ও বোধহয় সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত একধরনের 'সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ' যা আমরা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টির শুরু থেকে বহন করে চলেছি! ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মত সরল কোষী জীব

যারা যৌন জনন নয়, বরং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অমর। এদের দেহ কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়, তার পর বিভাজিত অংশগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিভাজিত হয়; কোন অংশই আসলে সেভাবে 'মৃত্যুবরণ' করে না।

আবার অধিকাংশ ক্যান্সার কোষই অমর, অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে তো বটেই। একটি সাধারণ কোষকে জীবদ্দশায় মোটামুটি গোটা পঞ্চাশেক বার কালচার বা পুরুৎপাদন করা যায়। এই হাফ-সেঞ্চুরির সীমাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হেফ্লিক লিমিট' (Hayflick Limit)। কখনো সখনো ক্যান্সারাক্রান্ত কোন কোন কোষে সংকীর্ণ টেলোমার থাকার কারণে এটি কোষস্থিত ডিএনএ'র মরণ জিনকে স্থায়ীভাবে 'সুইচ অফ' করিয়ে দেয় । এর ফলে এই কোষ তার আভ্যন্তরীন 'হেফ্লিক' লিমিটকে অতিক্রম করে যায়। তখন আক্ষরিকভাবেই অসংখ্যবার - মানে অসীম সংখ্যকবার সেই কোষকে কালচার করা সম্ভব। এই ব্যাপারটাই তাত্ত্বিকভাবে কোষটিকে প্রদান করে অমরত্ব। হেনরিয়েটা ল্যাকস নামে এক মহিলা ১৯৫২ সালে সার্ভিকাল ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর ডাক্তাররা ক্যান্সারাক্রান্ত দেহকোষটিকে সরিয়ে নিয়ে ল্যাবে রেখে দিয়েছিল। এই কোষের মরণজিন স্থায়ীভাবে 'সুইচ অফ' করা এবং কোষটি এখনো ল্যাবরেটরীর জারে বহাল তবিয়তে 'জীবিত' অবস্থায় আছে। প্রতিদিনই এই সেল থেকে কয়েশ বার করে সেল-কালচার করা হচ্ছে, এই কোষকে এখন 'হেলা কোষ' নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোন দিন ভবিষ্যত- প্রযুক্তি আর জৈবমুল্যবোধ (bioethics) আমাদের সেই সুযোগ দেয়, তবে আমরা হয়ত হেলাকোষ ক্লোন করে হেনরিয়েটাকে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফেরত আনতে পারব।

আবার ব্রাইন শ্রিম্প (brine shrimp), গোলকৃমি বা নেমাটোড, কিংবা টার্ডিগ্রেডের মত কিছু প্রাণি আছে যারা মৃত্যুকে লুকিয়ে রাখতে পারে, জীববিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাকে বলে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'। যেমন, ব্রাইন শ্রিম্পগুলো লবনাক্ত পানিতে সমানে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, কিন্তু পানি যখন শুকিয়ে যায়, তখন তারা ডিম্বানু উৎপাদন, এমনকি নিজেদের দেহের বৃদ্ধি কিংবা মেটাবলিজম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। শ্রিম্পগুলোকে দেখতে তখন মৃত মনে হলেও এরা আসলে মৃত নয় - বরং এদের এই মরণাপন্ন মধ্যেও জীবনের বীজ লুকানো থাকে। এই অবস্থাটিকেই বলে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'। আবার কখনো তারা পানি খুঁজে পেলে আবারো নতুন করে 'নবজীবন প্রাপ্ত' হয়। এদের অদ্ভুতুরে ব্যাপার স্যাপার অনেকটা ভাইরাসের মত। ভাইরাসের কথা আরেকবার চিন্তা করা যাক। ভাইরাস জীবণ ও জড়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। ভাইরাসকে কেউ জড় বলতে পারেন, আবার জীবিত বলতেও বাঁধা নেই। এমনিতে ভাইরাস 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। ভাইরাসে থাকে প্রোটিনবাহী নিউক্লিয়িক এসিড। এই নিউক্লিয়িক এসিডই ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের আধার। উপযুক্ত পোষক দেহ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'-এ জীবনকে লুকিয়ে রাখে। আর তারপর উপযুক্ত দেহ পেলে আবারো কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অমরত্বের খেলা চালিয়ে যেতে থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে 'মৃত্যু' ব্যাপারটি সব জীবের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক নয়। ভাইরাসের আনবিক সজ্জার মধ্যেই আসলে লুকিয়ে আছে অমরত্বের বীজ। এই অঙ্গসজ্জাই আসলে ডিএনএর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় তারা কখন ঘাপটি মেরে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'-এ পড়ে থাকবে, আর কখন নবজীবনের ঝর্ণাধারায়

নিজেদের আলোকিত করবে। সে হিসেবে ভাইরাসেরা আক্ষরিক অর্থেই কিন্তু অমর - এরা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে না। তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে জীবাণুনাশের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আলাদা। ঔষধের প্রয়োগে আসলে এদের অংগসজ্জা ভেঙে দেওয়া হয়, যেন তারা আবার পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে রোগ ছড়াতে না পারে। ঠিক একই রকম ভাবে অত্যধিক বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ করেও ভাইরাসের এই দেহগত অঙ্গসজ্জা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে এদের আনবিক গঠণ বিনষ্ট হবে এবং এদের জীবনের সুপ্ত আধার হারিয়ে যাবে। ফলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেও এরা আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে না। যারা জীবন-মত্যুর ব্যাপারটিকে আরো ভালমত বিজ্ঞানের গভীরে গিয়ে বুঝতে চান তারা আনবিক জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম সি ক্লার্কের লেখা '[Sex and the Origins of Death]' বইটি পড়তে পারেন [৬]। আমার আর ফরিদের লেখা '[মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে]' (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) বইটির প্রথম অধ্যায়েও বেশ কিছু আকর্ষনীয় উদাহরণ হাজির করে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠিকেরা পড়ে নিতে পারেন ।

রমন লাম্বার মত মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি দলছুট ব্যান্ডের গায়ক সঞ্জীব চৌধুরীরও। এই সুপ্রতিষ্ঠিত গায়কের ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণে মস্তিস্ক তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছিল। তিনি চলে গিয়েছিলেন কোমায়। কোমায় একবার কেউ চলে গেলে তাকে পুনরায় জীবনে ফেরৎ আনা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব ব্যাপার। কোমার স্থায়িত্ব সাধারণতঃ দুই থেকে চার সপ্তাহ থাকে। যারা চেতনা ফিরে পান, তারা সাধারণতঃ ২/১ দিনের মধ্যেই তা ফিরে পান। বাকীদের অনেকেই মারা যান, কিন্তু অনেকে কোমা থেকে উঠে আসেন বটে কিন্তু রয়ে যান অচেতন দশায় - যাকে মেডিকেলের ভাষায় বলে 'নিষ্ক্রিয় দশা' বা 'ভেজিটেটিভ স্টেট' (vegetative state)। ডাক্তার এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য এ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কারণ রোগীর দেহটা বেঁচে থাকলেও মস্তিস্ক থাকে নিস্ক্রিয়। টেকনিকালি, এদের তখন মৃতও বলাও যায় না, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস সহ কিছু শারীরিক কাজ কর্ম চলতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই। মাসাধিককাল পর এ ধরনের রোগীরা পৌছে যান 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা'য় (Persistent vegetative state)। যতই দিন পেরুতে থাকে রোগীর সচেতনতা আবারো ফিরে আসার সম্ভাবনা কমতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিস্কের কোষগুলো ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে। ওই সময় কৃত্রিমভাবে তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তার চৈতন্য আর ফেরৎ আসে না। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার মাল্টি সোসাইটি টাস্ক-ফোর্সের এগার জন গবেষকের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশায় রোগী একবার পৌঁছে গেলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা চলে যায় শুন্যের কাছাকাছি[৩৮]। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর ডাক্তারদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় রোগীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপন করার, কারণ ততদিনে তাদের জানা হয়ে যায় যে, এ রোগী আর চৈতন্য ফিরে পাবে না। পাঠকদের নিশ্চয় ফ্লোরিডার টেরি শাইভোর ঘটনার কথা মনে আছে, যার খবর সারা আমেরিকা জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। ১৫ বছর ধরে 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা'য় থাকার পর টেরি শাইভোর স্বামীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে যখন ডাক্তাররা টেরির মুখ থেকে খাদ্যনালী খুলে দিয়ে তার 'দেহাবসান' ঘটানোর উদ্যোগ নিলেন, তখন তা আমেরিকার রাজনৈতিক মহলকে তোলপার করে তুলেছিল। রক্ষণশীলেরা ডাক্তারদের এ নাফরমানিকে দেখেছিলেন 'খোদার উপর খোদকারী'র দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু ডাক্তারদের করণীয় ছিল না কিছুই। টেরি শাইভোর সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই থেকে দেখা গিয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে ব্রেন টিস্যুর অনেকটুকুই নষ্ট হয়ে গেছে। আদালতের রায়ও গিয়েছিল ডাক্তারদের অনুকূলেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাক্তারেরা কোন্ আলামতের ভিত্তিতে সিধান্ত নেন যে, রোগী স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে নাকি চেতনা ফিরে পাবার আশা আছে? এটি নিঃসন্দেহ, ডাক্তার যদি বোঝেন যে, চেতনা ফিরে আসার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও আছে, তাহলে কখনোই দেহবাসনের মাধ্যমে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করবেন না। ডাক্তাররা আসলে সিদ্ধান্ত নেন 'ব্রেন ইমেজিং টেকনিক' নামে এক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিস্ক পর্যবেক্ষণ করে - তারা দেখেন আহত মস্তিস্কে আদৌ কোন ধরণের বোধ শক্তি কিংবা চেতনার আলামত পাওয়া যাচ্ছে কিনা । অনেক সময় এই আলামত খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে - সহজে ধরা যায় না। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে - ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট'। কাজেই ডাক্তারদেরকে খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, এবং তা দীর্ঘমেয়াদী। যেমন, এড্রিয়ান ওয়েনের নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের তত্ত্বাবধানে ২৩ বছরের এক তরুনী চিকিৎসারত অবস্থায় আছে। ভয়াবহ সরক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত এ তরুনীর মস্তিস্ক বেশ ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক সপ্তাহ কোমায় থাকার পর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে 'নিষ্ক্রিয় দশা'য় এসে ভীরলেন। সেই তরুনী এখন চোখের পাপড়ি মেলতে পারেন, কিন্তু বাইরের কোন নির্দেশ পালন করার নূন্যতম আলামত কখনোই দেখান নি। ডাক্তারেরা মেয়েটির মস্তিস্ক কি অবস্থায় আছে তা নিঃসন্দেহ হবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা চালালেন। যেমন, রোগীর সামনে গিয়ে বললেন, 'কফির জন্য চিনি আর দুধ টেবিলে রাখা আছে, খাও'। এই মন্তব্যের কি প্রতিক্রিয়া রোগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জন্য fMRI স্ক্যান করে খুঁজে দেখলেন চিকিৎসকেরা। দেখলেন, ব্রেনের ভিতরে *টেম্পোলার গাইরি* নামের যে জায়গাটা আছে সেটা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। মাথার এই জায়গাটা সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা শোনা এবং বোঝার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটুকু বোঝা গেল, হয়ত মেয়েটি সচেতন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ অনেক সময় গভীর ঘুমে থাকা মানুষের সামনেও এ ধরণের নির্দেশ দিলে তাদের মাথার এই জায়গাগুলো উদ্দীপ্ত হয়।

আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারেরা ঠিক করলেন, রোগীকে দিয়ে টেনিস খেলাবেন। রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল - 'মনে কর তুমি টেনিস গ্রাউন্ডে আছ। আস এবার আমার সাথে টেনিস খেল দেখি!' নিঃসন্দেহে টেনিস খেলার প্রক্রিয়াটি এমনিতে বেশ জটিল। মাথার অনেকগুলো অংশের সমন্বিত সংযোগ করে তবে খেলাটা ঠিকমত খেলতে হয়। মাথার একটি অংশ আছে - *সাপ্লিমেন্টারি মোটর* এলাকা। এই এলাকাটা দেহের হাত-পা সহ অন্যান্য অংগ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেল তরুনীর মোটর এলাকা অনবরত উদ্দীপ্ত হচ্ছে। টেনিস খেললে তাই হওয়ার কথা। আবার রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল - 'এবার মনে কর তুমি তোমার বাড়ীতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছ'। মস্তিস্ক স্ক্যান করে দেখা গেল এবারে মাথার *প্রিমোটর, প্যারিটাল* আর *প্যারাহিপোক্যাম্পাল* এলাকা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়। বোঝা গেল মেয়েটি সম্ভবতঃ সচেতন অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ ধরণের রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা একেবারে শূন্য নয়, বরং পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মন্দ নয় সম্ভাবনা। আর সেজন্যই মেয়েটিকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এবং মেয়েটিও এভাবেই 'মিনিমালি কনশাস স্টেটে' রয়েছে- কখনো ডাক্তারের নির্দেশ মানছে, কখনো নয়।

অনেকদিন ধরে 'মিনিমালি কনশাস স্টেটে' থাকার পর আবার মোটামুটি সচেতন অবস্থায় ফিরবার উদাহরণ হচ্ছে আরকান্সাসের টেরি ওয়ালিসের ঘটনা। তিনিও এক ভয়ঙ্কর ধরনের সরক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ১৯৮৪

সালে চেতনা হারান এবং প্রায় ১৯ বছর ধরে ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট'-এ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ২০০৩ সালে এসে টেরি ওয়ালিস কথা বলতে শুরু করেন। সেই সাথে হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও কিছুটা ফিরে পান। এখনো তিনি হাটতে চলতে পারেন না, এবং কারো না কারো সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়, কিন্তু তারপরও টেরি ওয়ালিসের উন্নতি লক্ষ্যনীয়। এথেকে বোঝা যায়, ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট' থেকে আবার সচেতনতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব; কিন্তু 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা' বা পার্মানেন্ট ভেজিটিটিভ স্টেট থেকে প্রত্যাবর্তন অনেকটা দূরাশাই বলতে হবে। নীচের ছবিটি দেখলে এ ব্যাপারটি হয়ত পাঠকদের জন্য আরো পরিস্কার হবে :

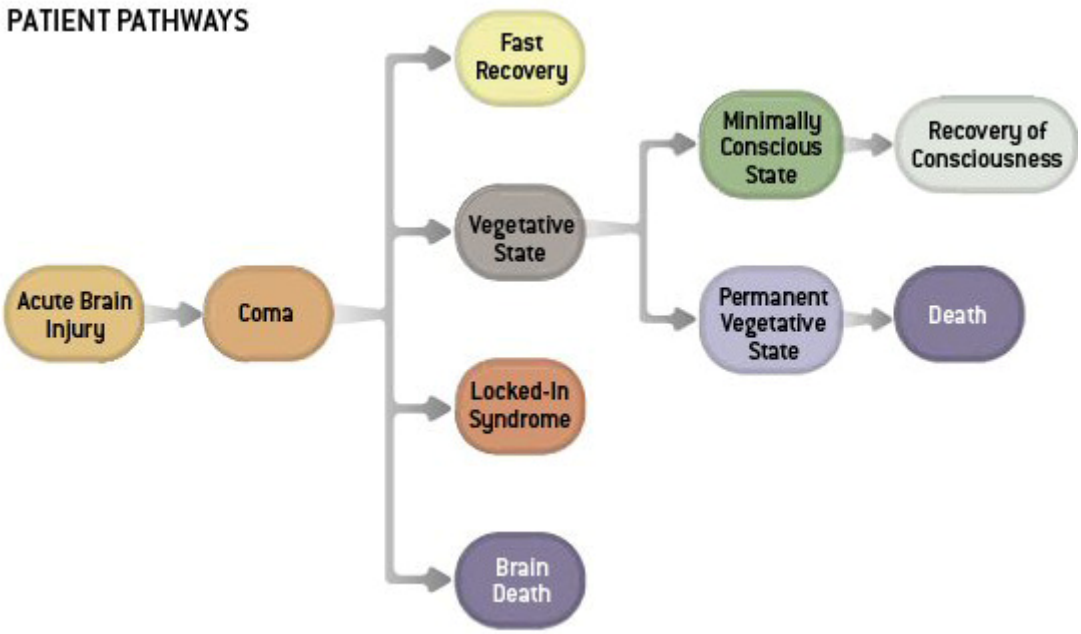

চিত্রঃ মস্তিস্কে আঘাত পেয়ে কোমায় চলে যাওয়া রোগীদের বিভিন্ন অবস্থা।

মৃত্যু নিয়ে আর কিছু কথা বলা যাক। আসলে মানুষের মত বহুকোষী উচ্চশ্রেনীর প্রাণীদের মৃত্যু দু' ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ রয়েছে - মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, আর ফুসফুস। যে কোন একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বা কিংবা সঞ্জীব চৌধুরীর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে; হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সিয়া। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু 'মৃত্যু' ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতোটা কঠিন ছিলো না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিস্কার

এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কিভাবে এখন হলফ করে সেই 'হৃদয়দাতা'কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে ফেললো শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিষ্কার করে- যেটি হৃৎপিন্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আধুনিক কোন কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে - 'হে হিমশীতল মৃত্যু - তুমি হচ্ছ রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপন!'

যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্বিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথ যাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে - কারো কারো জন্য কম সময়ের জন্য, আবার কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্যজন্মলাভ করা শিশু ফে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিলো একটি বেবুনের হৃৎপিন্ড সংযোজন করে।

আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের 'জীবন প্রাপ্তি'র উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচবার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোন সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া যায় আর ওটি ঠিকমত জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এতো ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোন যকৃত পাওয়া যাচ্ছিলো না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিলো আর মৃত্যুর থাবা হলুদ থেকে হলুদাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে, ঠিক সে সময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরণের সরক দূর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে হুড়াহুড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিলো না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংগপ্রত্যংগগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিলো। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা এতো দুঃখের মাঝেও মানবিক কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করেননি। তিনি পারমানেন্ট ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জ্জীবিত জেমি আজো বেঁচে আছে- পড়াশুনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের পচিশটি বছর!

এবার আসুন প্রিয় পাঠক - আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের উপর দিয়ে স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে হিমশীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ। প্রায় আধাঘন্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিয়েছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস

কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রুষার শুরু করার প্রায় একঘন্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারো 'নতুন করে' ফিরে আসতে শুরু করলো। আসলে ঠান্ডা পানির তীব্র ঝাপ্টা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিলো। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসসুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগগুলো কিন্তু একটি 'মিনিমাম লেভেলে' কাজ করে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলো যথেষ্ট। চিকিৎসকরা একমত যে, বরফ শীতল ঠান্ডা পানি অনেকক্ষেত্রেই ক্লোরফর্মের মত অবচেতকের কাজ করে - অতিশীতল তাপমাত্রায় তখন দেহ চলে যায় 'হাইবারনেশন' বা শীতনিদ্রায় -ব্যাঙ, সাপ, বাদুর, কিছু মাছে যা হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায় । দেখা গেছে এধরনের অবস্থায় দেহের বিপাকক্রিয়ার হার কমে যায়, এবং দেহের জন্য যতটুকু খাবার কিংবা অক্সিজেন সুস্থ অবস্থায় প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম শক্তি খরচ করে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আর তাই এ ধরণের পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েও বেঁচে যাবার উদাহরণ কিন্তু জিমি একা নয়। লস ভেগাসের মুরে ব্রাউন আধাঘন্টা, উতাহ শহরে মিশেল ফাঙ্ক একঘন্ট্আর ক্যানাডার তের মাসের শিশু এরিকা নরডবাই দুই ঘন্টা ধরে বরফ-জলে ডুবে অচেতন হয়ে থাকবার পরও চিকিৎসকরা তাদের কিন্তু বাঁচাতে পেরেছেন। তবে সবচেয়ে অবাক করেছে জাপানের মিৎসুতাকা উছিকোশির ঘটনা। জাপানের রোকো পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন পরিবেশে ২৪ দিন ধরে অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার পরও কোব্ব সিটি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তোলা গেছে [১৭]।

এবারে আসি মৃত্যুক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর 'সঠিক' সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিন্ড ১৫ মিনিট, কিডনী ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশী - ৬ ঘন্টা। অংগ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে তৎক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির যোগান থাকে। শক্তি উ□পন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

আত্মা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আত্মার ব্যাপারটা এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, সত্যই দেহাতীত কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তা অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন। আর আত্মায় বিশ্বাসী গবেষকেরা আত্মার অস্তিত্ব প্রামাণের জন্য নানা ধরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষার আয়োজন করেছেন। ১৯২১ সালে ডা: ডানকান ম্যাকডোগাল তাঁর বিখ্যাত "২১ গ্রাম পরীক্ষা" সম্পন্ন করেন[১৮]। তিনি দাবী করেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আত্মার ওজন নির্ণয় করতে পেরেছেন। তাঁর পরীক্ষা ছিল খুবই সহজ। তাঁর দাবী অনুযায়ী তিনি ছয় জন রোগীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের এবং পরবর্তী মুহূর্তের দেহের ওজন মেপে দেখেন, ওজনের পার্থক্য ১১ গ্রাম থেকে ৪৩ গ্রামের মধ্যে (মিডিয়ায় যেমন আত্মার ওজন একদম মাপমত ২১ গ্রাম

বলে প্রচার করা হয়, হুবহু তা অবশ্য পাননি)। ঠিক একইভাবে তিনি ছয়টি কুকুরের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন, এবং একই ভাবে ওজন মেপে দেখেন ওজনের কোন পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, মানুষেরই কেবল আত্মা আছে। কুকুর বিড়াল জাতীয় ইতর প্রাণীর আত্মা নেই। তাঁর এই পরীক্ষা মিডিয়ায় চমক সৃষ্টি করলেও বৈজ্ঞানিক মহলে অচীরেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ ম্যাকডোগাল নিজে বা অন্য কেউই এই ২১ গ্রামের পরীক্ষা পুনর্বার সম্পন্ন করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন নি, যা বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহনযোগ্যতা পাওয়ার অন্যতম মাপকাঠি। শুধু পরীক্ষাটি পুনর্বার সম্পন্ন করা গেল না- এটিই কেবল নয়, পরীক্ষার উপাত্ত বা ডেটা নিয়েও ছিল সমস্যা। ম্যাকডোগাল নিজেই তার গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছিলেন, তার গৃহীত ছয়টি উপাত্তের মধ্যে দুটোকে নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন কোন "ভ্যালু" না থাকার কারণে। দুটো উপাত্তে দেখালেন যে ওতে ওজন "ড্রপ" করেছে, এবং পরবর্তীতে এই ওজন আরো কমে গেল (আত্মা বাবাজী বোধ হয় 'খ্যাপে খ্যাপে' দেহত্যাগ করছিল!), আরেকটি ডেটায় ওজন হ্রাস না ঘটে বরং বিপরীতটাই ঘটতে দেখা গিয়েছিল, পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোন হ্রাসের ব্যাপার স্যাপার (এক্ষেত্রে বোধ হয় আত্মা বাবাজী সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না উনি কি দেহত্যাগ করবেন, নাকি করবেন না, নাকি দেহত্যাগ করে আবারও দেহে পুন:প্রবেশ করবেন, নাকি দেহকে চিরবিদায় জানাবেন!); শুধুমাত্র একটি উপাত্ত থেকে ওজন হ্রাসের ব্যাপারটা আঁচ করা গেল এবং জানা গেল এটি এক আউন্সের ৩/৪ ভাগ[২৩] । এই একটিমাত্র ডেটা থেকে আসা সিদ্ধান্ত ভিত্তিক কোন প্রবন্ধ গবেষণা সাময়িকীতে স্থান করতে পারা অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে।

ম্যাকডোগালের "গবেষণার" ফলাফল প্রকাশের পর পরই ড: অগাস্টাস পি ক্লার্ক নামের একজন ডাক্তার আমেরিকান মেডিসিন জার্নালে ম্যাকডোগালের কাজের সমালোচনা করে লেখেন যে, ম্যাকডোগাল এখানে খুব স্বাভাবিক আনুকল্পটির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন : তা হচ্ছে এই ওজন হ্রাসের (যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে) ব্যাপারটাকে বাষ্পীভবনের (evaporation) মাধ্যমে দেহের পানি ত্যাগ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু পরমুহুর্তে দেহের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, এবং ফুসফুসের মধ্যকার বাতাস আর রক্তকে আর ঠান্ডা করতে পারে না। ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর দেহের লোমমকূপের মাধ্যমে পানি ইভাপোরেট করে বের হয়ে যাওয়ায় ওজন ঘাততি দেখা যেতে পারে। ড: অগাস্টাস পি ক্লার্কের এই ব্যাখা থেকে এটাও পরিস্কার হয় কেন কুকুরের ক্ষেত্রে কোন ওজন হ্রাসের ব্যাপার ঘটেনি। কারণ কুকুর মানুষের মত ঘামের মাধ্যমে দেহকে ঠান্ডা করে না। তারা করে 'প্যান্টিং' (panting)-এর মাধ্যমে।

আত্মা নিয়ে আরও অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ব্রুস গ্রেসনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার (near death experience, সংক্ষেপে NDE) পরীক্ষা। দেহবিচ্যুত আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে আকর্ষণীয় সব অভিজ্ঞতার (Out of Body Experience, সংক্ষেপে ODE) কথা ঢালাওভাবে অনেক মুমূর্ষু রোগী রোগমুক্তির পর বিভিন্ন মিডিয়ায় দাবী করে থাকেন । ব্যাপারগুলো কতটুকু সত্য তা পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাইলেন ব্রুস গ্রেসন। কিভাবে ব্রুস এ পরীক্ষাটি করলেন সেখানে যাওয়ার আগে এই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা বা এনডিই এবং দেহবিচ্যুত অভিজ্ঞতা বা ওডিই নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু কথা বলে নেয়া যাক। আমার খুব পরিচিতজনের অভিজ্ঞতার কথাই

বলি। বেশ কবছর আগের কথা। আমার জীবন সাথী বন্যা একবার গাড়িতে উঠতে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে মাথায় টক্কর লেগে খেল দরাম করে এক বারি। গাড়িতে উঠে বলতে লাগল তার সারা গা নাকি অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপদের কথা। তারাতারি তাকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হল। চেতন - অচেতনের মাঝামাঝি কোন এক স্টেটে ছিল সে সময়টা (পরে বলেছিল সারাটা সময় নাকি তার মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে, যদিও তার মনে হয়েছিল মৃত্যু ব্যাপারটা তেমন ভয়ানক কিছু না)। হয়ত কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে থাকতে পারে সে। ভাগ্য ভাল, হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেওয়ার পর ডাক্তারদের সেবা যত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পায় সে। একটু পরে দিব্যি সুস্থ সবল হয়ে বাসায় ফিরে এল। কিন্তু হাসপাতালে ওই আধো জাগা আধো অচেতন অবস্থার মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলে সে। এই অভিজ্ঞতার কথা সে এখনও সুযোগ পেলেই বলে বেড়ায়। সে দেখছিল (নাকি বলা উচিত 'অনুভব' করেছিল), সে নাকি দেহ বিযুক্ত হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে। তার কোন ওজন নেই। হাল্কা পালকের মত হয়ে গেছে সে। ওভাবে ভেসে ভেসেই হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের শঙ্কিত মুখগুলোও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল সে। সারা ঘরের কোথায় কি আছে সবই দেখছিল উপর থেকে। টেবিলে রাখা পানির গ্লাস, বিছানার এলোমেলো চাদর, চিন্তিত লোকজনের মুখ, সবকিছু। সাইকোলজিস্টরা এ অবস্থাকেই বলেন 'আউট অব বডি এক্সপেরিয়েন্স'। বিশ্বাসীরা এগুলোতে আত্মার দেহবিচ্যুত অবস্থার অপার্থিব নিদর্শন খুজে পান। মুমূর্ষু বা মরণপ্রান্তিক অবস্থাতেই নাকি এ অভিজ্ঞতাগুলো বেশি দেখা যায়। রোগিদের অনেকে এসঅময় বিরাট বড় টানেলের শেযে আলো দেখা সহ নানা ধরণের আধি-ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। কেউ কেউ হাসপাতালের বিছানায় শায়িত চারিদিকে ডাক্তার-নার্স পরিবেষ্টিত নিজের মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে পান। ব্রুস গ্রেসন ঠিক করলেন এ অভিজ্ঞতার গল্পগুলো আসলেই সত্য, নাকি মুমুর্ষু অবস্থায় মনোবৈকল্য, তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তাঁর ল্যাপটপটি সাথে নিয়ে এলেন আর তাতে প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রঙ্গীন ছবি (যেমন, উড়োজাহাজ, নৌকা, প্রজাপতি, ফুল ইত্যাদি) বিক্ষিপ্তভাবে (রেন্ডমলি) ফুটিয়ে তুললেন। তারপর তিনি ল্যাপটপটিকে স্থাপন করলেন হাসপাতালের হার্টের অস্ত্রপ্রচার কক্ষের ছাদের কাছাকাছি কোথাও - এমন একটা জায়গায় যেখানে অস্ত্রপ্রচারের সময় রোগির দৃষ্টি পৌঁছয় না, কিন্তু দেহবিযুক্ত আত্মা হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেড়ালে তা রোগির দেখতে পাওয়ার কথা। গ্রেসন এনডিই এবং ওডিই'র দাবীদার পঞ্চাশ জন রোগির ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি চালনা করলেন, কিন্তু একজন রোগিও সঠিকভাবে ল্যাপটপের ছবিগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি [১৮] । ঠিক একই ধরণের পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জ্যান হোল্ডেন। তিনিও গ্রেসনের মতই নেগেটিভ ফলাফল পেলেন[১৬]।

আসলে তাই পাওয়ার কথা। যদি আত্মার মাধ্যমে তথাকথিত পরজগতের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হত তবে এই নব্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জগতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলত। আমাদের এত দিনের প্রচেষ্টায় বস্তুবাদি ধ্যান ধারণার যে বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ পলে পলে গড়ে উঠেছে তা অচীরেই ধ্বসে পড়ত, বদলে যেত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীজগতের এবং সর্বোপরি মানুষের উপত্তির সামগ্রিক ধ্যান ধারণা। মানব আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে রাতারাতি তা প্রকৃতিতে মানুষকে প্রদান করত এক অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা। কিন্তু তা হয়নি। বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সময়ের সকল আবিস্কার গেছে এই মানবকেন্দ্রিক ধারণার বিপরীতে। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন আমাদের আবাসভুমি পৃথিবী নামের গ্রহটি কোন বিশিষ্ট গ্রহ নয়, এটি না মহাবিশ্বের না এ

সৌরজগতের কেন্দ্র। বরং লক্ষ কোটি গ্রহ তারকার ভীরে হারিয়ে যাওয়া সামান্য গ্রহ বৈ এটি কিছু নয়। এ যেন ছিল সনাতন চিন্তাভাবনার পিঠে এক রূঢ় চাবুক। এতদিনকার প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা, উপকথা আর ধর্মগ্রন্থের বাণীতে পৃথিবী যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা কোপার্নিকাসের এক চাবুকে যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তারপর ডারউইন এসে আরেক দফা চাবুক কষলেন। তিনি দেখালেন এ পৃথিবীর মত এর বাসিন্দা মানুষও কোন বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং অন্যান্য প্রাণিকূলের মতই দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ফল। এতদিন ধরে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, নিজেকে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ভেবে যে বিশ্বাসের পসরা সাজিয়ে এসেছিল, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে সেই বিশ্বাসের প্রাসাদোপম অট্টালিকা যেন তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ল। পরবর্তীতে আলেকজান্ডার ওপারিন, হাল্ডেন, ইউরে-মিলার, সিডনী ফক্সের ক্রমিক গবেষণা বিবর্তনকে নিয়ে গেল সূক্ষ রাসায়নিক স্তরে- যা অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষকে (অজৈবজনি) বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক সমাজে অজৈবজনি এবং বিবর্তন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষ আত্মার অস্তিত্ব ছারাই জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কৌতুহলী পাঠকেরা এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে বন্যা আহমেদের "বিবর্তনের পথ ধরে" (অবসর, ২০০৭)[৩৭] এবং আমার ও ফরিদ আহমেদের লেখা "মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে" (অবসর, ২০০৭)[১৯] বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আত্মা যদি নাই থাকল, বিভিন্ন জনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে (এনডিই এবং ওডিই) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ওই যে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে যে দেখতে পায় তারা হাসপাতালের কক্ষ জুড়ে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে? এরা কি সবাই তবে মিথ্যে বলছে? না মোটেও তা নয়। আর তাছাড়া ওভাবে সবাইকে মিথ্যেবাদী বানাতে গেলে 'ঠগ বাছতে গা উজারের' দশা হবে। কারণ এ ধরণের ওডিই-অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবাণদের সংখ্যা এ পৃথিবীতে নেহাত কম তো নয়। দেহ থেকে বের হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ানোই কেবল নয়, কেউ এ সময় টানেলের শেষপ্রান্তে উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়, কেউ বা মৃত লোকজনের (যেমন সন্ত, যীশু খ্রীষ্ট, মুহম্মদ, ফেরেশতা, মৃত আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি) দেখা পায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ লোক মনে করে তাদের জীবনের কোন না কোন সময় ওডিই বা এনডিই -এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

এর ব্যখ্যা অবশ্যই আছে, এবং তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেই বেরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মস্তিস্ক আমাদের দেহের এক অতি জটিল অংগ। কি রকম জটিল একটু কল্পণা করা যাক। মস্তিস্কের জটিলতাকে অনেক সময় মহাবিশ্বের জটিলতার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। কোটি কোটি গ্রহ -নক্ষত্র ছরিয়ে ছিটিয়ে থেকে আমাদের পরিচিত এই সুবিশাল এই মহাবিশ্বে তৈরি হয়েছে বিশাল বপুর সব সৌরজগত কিংবা ছায়াপথের। ঠিক একই রকমভাবে বলা যায়, আমাদের করোটির ভিতরে প্রায় দেড় কিলো ওজনের এই থকথকে ধুসর পদার্থটির মধ্যে গাদাগাদি করে লুকয়ে আছে প্রায় দশ হাজার কোটি নিউরন আর কোটি কোটি সায়ন্যাপসেস; আর সেইসাথ সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, ডাইসেফেলন আর ব্রেইনস্টেমে বিভক্ত হয়ে তৈরি করেছে জটিলতম সব কাঠামোর। আমি যখন ২০০২ সালে আমার পিএইচডির কাজ শুরু করতে গিয়ে মস্তিষ্কের মডেলিং করছিলাম তখন ব্রেনের প্রায় তেতাল্লিশটি কাঠামো (প্রত্যংগ) সনাক্ত করে মডেলিং করেছিলাম। সেগুলোর ছিল বিদ্ঘুটে সমস্ত নাম - কর্পাস ক্যালোসাম, ফরনিক্স, হিপোক্যাম্পাস, হাইপোথ্যাল্যাস, ইনসুলা, গাইরাস, কডেট নিউক্লিয়াস, পুটামেন, থ্যালমাস, সবাস্ট্যানশিয়া নাইয়াগ্রা,

ভেন্ট্রিকুলাস ইত্যাদি [২৪]। আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মমান্ড, চাল চলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিস্কের এই সমস্ত বিদ্গুটে নামধারী প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকান্ডের এবং তাদের কাজের সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে, মস্তিস্কের কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কিংবা এর কাজকর্ম বাধাগ্রস্থ হলে নানারকমের অদ্ভুতুরে এবং অতীন্দ্রীয় অনুভূতি হতে পারে।

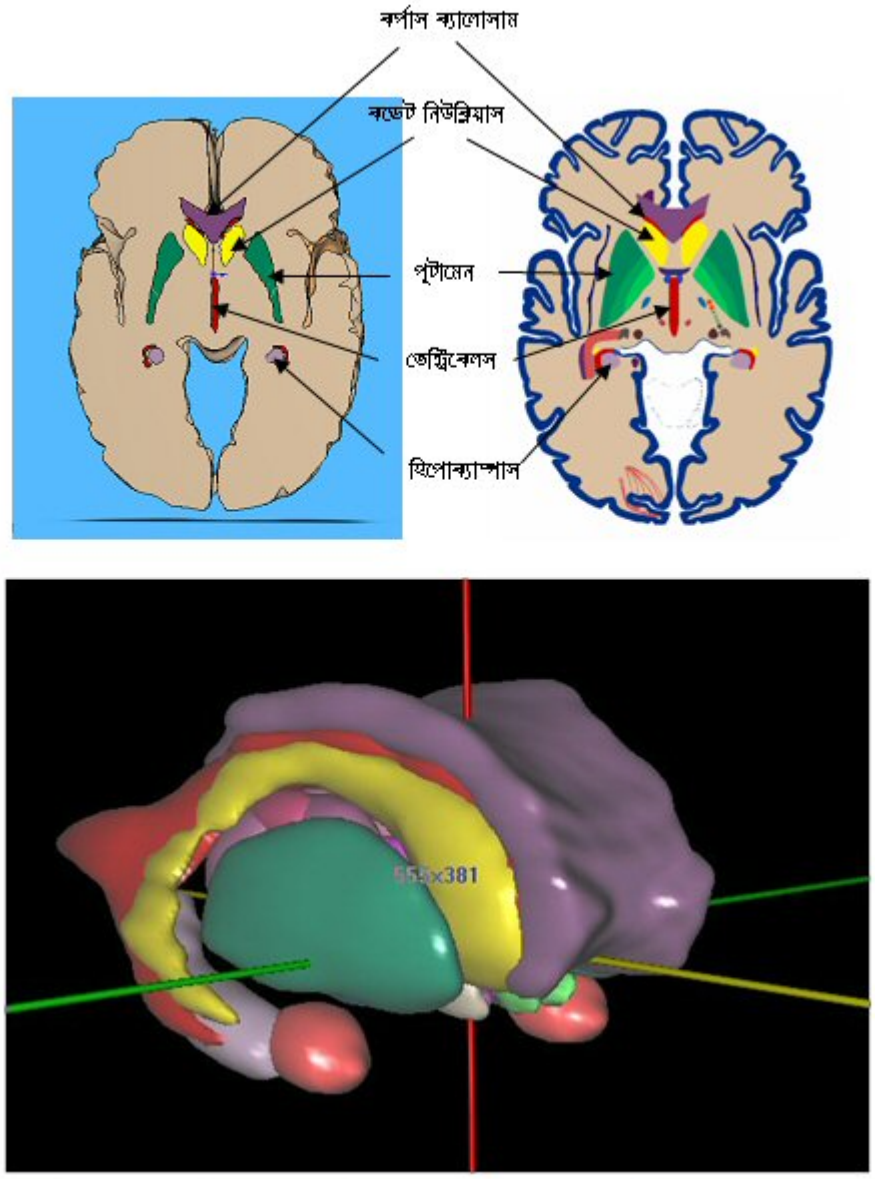

চিত্রঃ আমার পিএইচডির কাজের অংশ হিসেবে মানব মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করে ত্রি-মাত্রিক মডেলিং করতে হয়েছিল। আমি ৪৩ টি অংশ সঠিকভাবে সনাক্ত করে মডেলিং করেছিলাম[২৪]। উপরের ছবিতে আমার করা সেই মডেলিং-এর অংশবিশেষ দেখনো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মমান্ড, চাল চলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিস্কের এই সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকান্ডের এবং তাদের সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল।

যেমন, কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপুর্ণ কাঠামোটি মস্তিস্কের বামদিক এবং ডানদিকের কাজের সমন্বয়

সাধন করে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের ব্রেন একটি হলেও এটি মুলতঃ ডান এবং বাম - এই দুই গোলার্ধে বিভক্ত। এই দুই গোলার্ধকে আক্ষরিক অর্থেই আটকে রাখে দুই গোলার্ধের ঠিক মাঝখানে 'কাবাব মে হাড্ডি' হয়ে বসে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের প্রত্যংগটি। কোন কারণে মাথার মাঝখানের এই অংশটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে মাথার বামদিক এবং ডানদিকের সঠিক সমন্বয় ব্যাহত হয়। ফলে রোগীর দ্বৈতসত্ত্বার (Split Brain experience) উদ্ভব ঘটতে পারে।

ষাটের দশকে রজার স্পেরি, উইলসন এবং মাইকেল গ্যাজানিগার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেরিয়ে আসে মজার মজার সব তথ্য। দেখা গেল এ ধরনের রোগীদের মাথার বামদিক একধরনের চিন্তা করছে তো ডানদিক করছে আরেক ধরণের চিন্তা [৯, ২৫]। মাথার দুই ভাগই আলাদা আলাদা ভাবে কনশাস বা চেতনাময়। মাথার বামঅংশ পেশাগত জীবনে ড্রাফটসম্যান হতে চায়, তো ডান অংশ হতে চায় রেসিং ড্রাইভার [২৫]! এখন যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে সহজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়, মস্তিস্ক-বিভক্ত দ্বৈতসত্ত্বাধারী রোগীদের দেহে কি তাহলে দুটি আত্মা বিরাজ করছে? বাড়তি আত্মাটি তাহলে দেহে কোত্থেকে গজালো? বোঝাই যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা মিলে না, এর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে দিতে পারে 'দ্বিখন্ডিত মস্তিস্ক' এবং মাথার মাঝখানে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপূর্ন অংগের কাজকর্ম।

আবার বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন, হাইপোথ্যালমাস নামে মস্তিস্কের আরেকটি প্রত্যংগকে কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুতিক ভাবে উদ্দীপ্ত করে (মূলতঃ মৃগীরোগ সারাতে এ প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হত) দেহবিচ্যুত অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, অন্ততঃ রোগীরা মানসিকভাবে মনে করে যে সে দেহ বিযুক্ত হয়ে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে। এ ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয় মস্তিস্কে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে (হাইপারকার্বিয়া) কিংবা কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে (হাইপক্সিয়া)। কিছু কিছু ড্রাগ যেমন, ক্যাটামিন, এলএসডি, সিলোকারপিন, মেসকালিন প্রভৃতির প্রভাবে নানাধরনের অপার্থিব অনুভূতির উদ্ভব হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সমস্ত ড্রাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অচৈতন্যাবস্থা থেকে শুরু করে দেহ-বিযুক্ত অনুভূতি, আলোর ঝলকানি দেখা, পূর্জন্মের স্মৃতি রোমন্থন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সবকিছুই পাওয়া সম্ভব। আমি এক ভদ্রলোককে চিনতাম যিনি যীশুখ্রীষ্টকে দেখাবার এবং পাওয়ার জন্য এলএসডি সেবন করতেন। আমার আরেক বন্ধু প্রথমবারের মত গাঁজা খেয়ে এমন সমস্ত কান্ড কারখানা করা শুরু করেছিল যে মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে 'গরমে পুইড়া যাইতাছি', 'আমারে হাসপাতালে নিয়া যা' বলে হাউ মাউ কাঁদতে আর চ্যাচাতে লাগল। আমাদের তখন সদ্যকৈশোর উত্তীর্ণ বয়স, কলেজ পালিয়ে 'গাঁজা খেলে কেমন লাগে' - এই রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা তখন ব্যস্ত। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম সেরাতে। যদিও শেষটা বন্ধুটিকে হাসপাতালে নিতে হয়নি, কিন্তু পরদিন তার পাংশু মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলাম কি ধকলটাই গেছে তার উপর দিয়ে সারা রাত ধরে। সবাই মিলে চেপে ধরায় সে বলেছিল, 'সারা রাত ধরে আমি শুধু দেখছিলাম আমি একটা নিকষ কালো অন্ধকার টানেলের মধ্য দিয়ে হেটে চলেছি, আর সব কিছু আমার উপরে ভেঙ্গে পড়ছে'। গরম গরম বলে চ্যাচাচ্ছিলি কেন - এ প্রশ্ন করায় বলেছিল, তার নাকি মনে হয়েছিল টানেলের শেষেই দোজখের আগুন, সে আগুনে নাকি তাকে পুড়িয়ে ঝলসিয়ে কাবাব বানানো হবে! বলা বাহুল্য, এগুলো উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, মরণ-প্রান্তিক এবং দেহ-বিযুক্ত অনূভুতিগুলো আসলে

কিছুই নয়, আমাদের মস্তিস্কেরই স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল। আর এজন্যই শ্মশানঘাটের কোন কোন সাধু-সন্নাসী কেন গাঁজা, চরস, ভাং খেয়ে 'মা কালীকে পেয়ে গেছি' ভেবে নাচাচাচি করে, তা বোঝা যায়।

এ প্রসংগে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সুসান ব্ল্যাকমোরের কথা বলা যেতে পারে। সুসান ব্ল্যাকমোর মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিশেশজ্ঞ একজন মনোবিজ্ঞানী, ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এক সময় টেলিপ্যাথি, ইএসপি, পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী থাকলেও, আজ তিনি এ সমস্ত অলৌকিকতা, ধর্ম এবং পরজগত সম্বন্ধে সংশয়ী। সংশয়ী হয়েছেন নিজে বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলোর অনুসন্ধান করেই। তিনি 'ডাইং টু লিভ', 'ইন সার্চ অব দ্য লাইট' এবং 'মীম মেশিন' সহ বহু বইয়ের প্রণেতা। তিনি তার 'ডাইং টু লিভ : নিয়ার ডেথ এক্সপেরিএন্স' (১৯৯৩) বইয়ে উল্লেখ করেছেন অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালীন সময়ে (সত্তুরের দশকে) তিন বন্ধুর সাথে মিলে মারিজুয়ানা সেবন করে কিভাবে একদিন তার 'আউট অব বডি' অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিভাবে তিনি টানলের মধ্যদিয়ে ভেসে ভেসে বেরিয়েছিলেন, অক্সফোর্ডের বিল্ডিঙ্গের বাইরে ভাসতে ভাসতে আটলান্টিক মহাসগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে পৌছিয়েছিলেন, তারপর আবার নিজের দেহে ফিরে গিয়েছিলেন [৮] । তার এ অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে The Archives of Scientists' Transcendent Experiences (TASTE) ওয়েবসাইটে। কিন্তু সুসান ব্ল্যাকমোর যা করেননি তা হল অন্যান্য ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের মত 'ধর্মীয় আধ্যাতিকতার অপার মহিমায়' আপ্লুত হয়ে যাওয়া, কিংবা এঘটনার পেছনে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্রষ্টা, আত্মা কিংবা পরজগতের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া । বরং তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে এনডিই এবং ওবিই-এর বৈজ্ঞানিক কারণ অণুসন্ধান করেছেন এবং উপসংহারে পৌছিয়েছেন যে, মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো কোন পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং এগুলোকে ভালমত ব্যাখ্যা করা যায় স্নায়ু-রসায়ন (neurochemistry), শরীরবিজ্ঞান (physiology) এবং মনোবিজ্ঞান (psychology) থেকে আহৃত জ্ঞানের সাহায্যে[২৭] ।

চিত্রঃ মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার সময় অনেকেই টানেল বা সুরঙ্গ দেখে থাকেন ।

কেন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোতে কেবলই টানেল বা সুরঙ্গ দেখা যায়? বিশ্বাসীরা বলেন, ওটি ইহজগত

আর পরজগতের সংযোগ পথ। টানেলের পেছনে আলোর দিগন্ত আসলে পরজগতের প্রতীকী রূপ। কিন্তু তাহলে অবধারিতভাবে প্রশ্নের উদয় হয় - কেন কেবলই সুরঙ্গ? কেন কখনো দরজা নয় কিংবা নয় কোন বেহেস্তী কপাট কিংবা নয় গ্রীক মিথোলজীর আত্মা পাড়াপাড়ের সেই 'রিভার স্ট্যায়ক্স'? এখানেই সামনে চলে আসে আধ্যাতিকতার সাথে বিজ্ঞানের বিরোধের প্রশ্নটি। বিজ্ঞানীরা বলেন, 'সুরঙ্গ দর্শন' আসলে মরনপ্রান্তিক কোন ব্যাপার নয়, নয় কোন অপার্থিব ইঙ্গিত। সেজন্যই মরনপ্রান্তিক অবস্থার বাইরেও মৃগীরোগ, মাইগ্রেনের ব্যাথার সময় অনেকে সুরঙ্গ দেখে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে মস্তিস্ক যখন থাকে খুবই ক্লান্ত, শ্রান্ত, কিংবা কোন কাজে যখন চোখের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। আবার কখনো সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে এলএসডি, সাইলোকিবিন কিংবা মেসকালিনের মত ড্রাগ-সেবনে। আসলে স্নায়ুজ-কল্লোল (neural noise) এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের (retino-cortical mapping) সাহায্যে টানেলের মধ্য দিয়ে আঁধার থেকে আলোতে প্রবেশের আভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় [২৮]। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুজীববিজ্ঞানী জ্যাক কোয়ান (Jack Cowan) ১৯৮২ সালে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে গানিতিক মডেলের সাহায্যে ব্যাখা করেছেন [২৭]। তার মডেলের সাহায্যে কোয়ান দেখিয়েছেন, কর্টেক্সে ডোরা দাগ থাকলে তা আমাদের চোখে অনেকটা সর্পিল কুন্ডলী (spirals) আকারে রূপ নেবে। এগুলো আমরা ছোটবেলায় 'দৃষ্টি বিভ্রমের' (visual illusion) উদাহরণ হিসেবে দেখেছি। নীচে পাঠকদের জন্য এমনি একটি ছবি দেওয়া হল। ছবিটি দেখুন । বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলী বলে বিভ্রম হবে। যদিও বাস্তবতা হল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত।

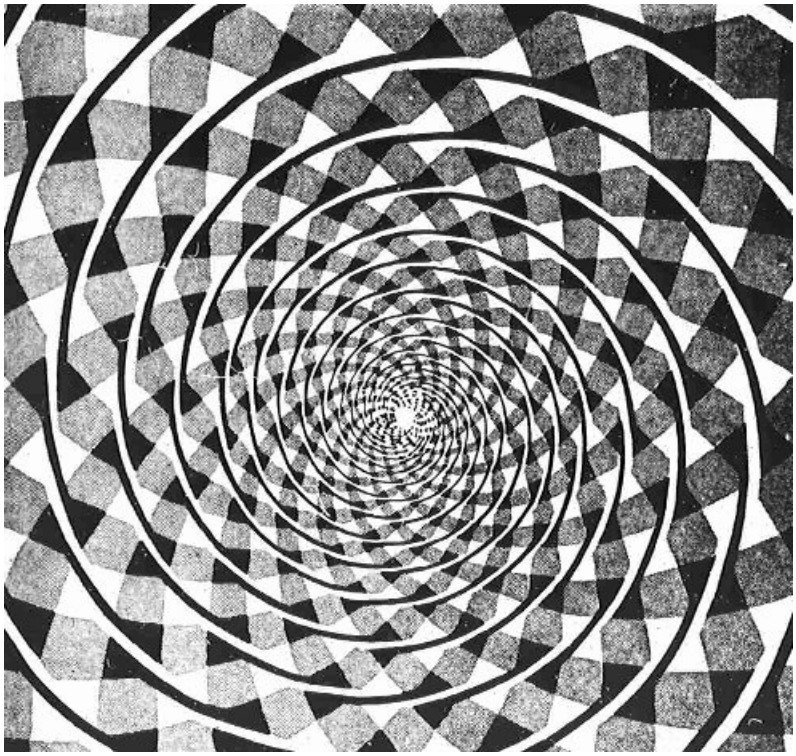

চিত্রঃ বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলীর টানেল বলে বিভ্রম হচ্ছে। যদিও বাস্তবতা হল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত। প্রমাণ হিসেবে ওগুলোর উপর আঙ্গুল ঘুরিয়ে দেখতে পারেন।

মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লাভের সময় প্রায় একই রকম বিভ্রম ঘটে মস্তিস্কের মধ্যেও। ড্রাগ সেবনের ফলে কিংবা অত্যদিক টেনশনে কিংবা অন্য কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে ভিজুয়াল কর্টেক্সের গতিপ্রকৃতি সততঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এ সময় ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই টানেল-সদৃশ প্যাটার্ণের দর্শন পেয়ে থাকেন। এটাই সুরঙ্গ-দর্শনের মূল কারণ। সুরঙ্গ দর্শনের এই স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের গাণিতিক মডেলটির পরবর্তীতে আরো উন্নতি ঘটান পল ব্রেসলফ, সুসান ব্ল্যাকমোর এবং ট্রস্কিয়াঙ্কো এবং অন্যান্যরা [২৮, ২৯]।

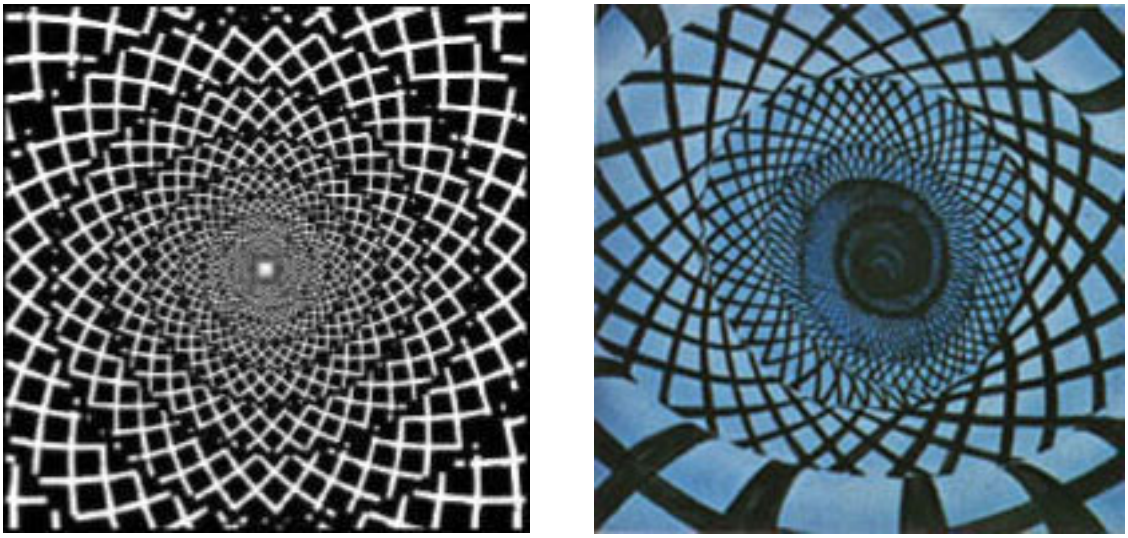

চিত্রঃ স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের সাহায্যে সুরংগ দর্শনের আভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে সুরঙ্গ-দর্শনের মাঝে অলৌকিক বা অপার্থিব কোন ব্যাপার নেই, নেই কোন পারলৌকিক রহস্য, যা আছে তা একেবারে নিরস, নিখাঁদ বিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, ফেলু মিত্তরের গোয়েন্দাগল্পের মত 'সুরঙ্গ-রহস্য' শেষ পর্যন্ত সমাধান করেছে বিজ্ঞানীরাই। শুধু রহস্য সমাধান নয়, গাণিতিক মডেল টডেল করাও সারা। শুধু তাই নয়, টানেলের পাশাপাশি কেন যীশুখ্রীষ্ট কিংবা মৃত-আত্মীয় স্বজনের দেখা যাচ্ছে তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যাপারটা হয়ত পুরোটাই সমাজ-সাংস্কৃতিক। যীশুখ্রীষ্টের দেখা পান তারাই, যারা দীর্ঘদিন খ্রীষ্টীয় জল-হাওয়ায় বড় হয়েছেন, বাবা মা, শিক্ষক, পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে 'খ্রীষ্টীয় সবক' পেয়েছেন। একজন হিন্দু কখনোই মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতায় খ্রীষ্টের দেখা পান না, তিনি পান বিষ্ণু, ইন্দ্র বা লক্ষীর দেখা, আর ভাগ্য খারাপ হলে 'যমদূতের'। আবার একজন মুসলিম হয়ত সেক্ষেত্রে দর্শন লাভ করেন আজরাইল ফেরেশতার। বোঝা যাচ্ছে, ধর্মীয় 'দিব্য দর্শন' কোন 'সার্জনীন সত্য' নয়, বরং, আজন্ম লালিত ধর্মানুগত্য আর নিজ নিজ সংস্কৃতির রকমফেরে ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত হয়। কাজেই, ঈশ্বর দর্শনই বলুন আর ধর্মীয় 'দিব্য দর্শন'-ই বলুন, এগুলোর উৎসও আসলে মানব মস্তিস্কই। দেখা গেছে মস্তিস্কের কোন কোন অংশকে উত্তেজিত করলে মানুষের পক্ষে ভুত, প্রেত,

ড্রাকুলা থেকে শুরু করে শয়তান, ফেরেশতা কিংবা ঈশ্বর দর্শন সব কিছুই সম্ভব। এ ব্যাপারটা আরো বিষদভাবে বুঝতে হলে আমাদের মস্তিস্কের একটি বিশেষ অংশ -'টেম্পোরাল লোব' সম্বন্ধে জানতে হবে।

টেম্পোরাল লোব : মস্তিস্কের 'গড স্পট'?

বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী আর গবেষকের দল অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন, ঈশ্বর দর্শন, দিব্যদর্শন, কিংবা ওহিপ্রাপ্তির মত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাগুলো আসলে স্রেফ মস্তিস্কসঞ্জাত। সেই ১৮৯২ সালের আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও এপিলেপ্সির সাথে 'ধর্মীয় আবেগের' সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা আরো ভালমত বোঝা গেল বিগত শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৫০ সালের দিকে উইল্ডার পেনফিল্ড নামের এক নিউরোসার্জন মস্তিস্কে অস্ত্রপ্রচার করার সময় ব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশকে বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপ্ত করে রোগীদের কাছে এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেন। যখন কোন রোগীর ক্ষেত্রে 'টেম্পোরাল লোব' (ছবিতে দেখুন)-এ ইলেক্ট্রোড ঢুকিয়ে উদ্দীপ্ত করতেন, তাদের অনেকে নানা ধরণের 'গায়েবী আওয়াজ' শুনতে পেতেন, যা অনেকেটা 'দিব্য দর্শনের' অনুরূপ [৩০]। এই ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হল, ১৯৭৫ সালে যখন বস্টোন ভেটেরান্স এডমিনিস্ট্রেশন হাসপাতালের স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ নরমান গেসচ উইল্ড-এর গবেষণায় প্রথম বারের মত এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগের সাথে টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক মিসফায়ারিং-এর একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল [৩১]। একই ক্রমধারায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ভিলায়ানুর এস রামাচান্দ্রণ তার গবেষণায় দেখালেন, টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি রোগীদের ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-দর্শন, ওহি-প্রাপ্তির মত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আস্বাদনের সম্ভাবনা বেশি [৩২]। এগুলো থেকে হয়ত অনুমান করা যায়, কেন আমাদের পরিচিত ধর্ম প্রবর্তকদের অনেকেই 'ওহি-প্রাপ্তির' আগে 'ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতেন', 'গায়েবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন' , তাদের 'কাপুনি দিয়ে জ্বর আসত' কিংবা তারা 'ঘন ঘন মুর্চ্ছা যেতেন'[৩৩]।

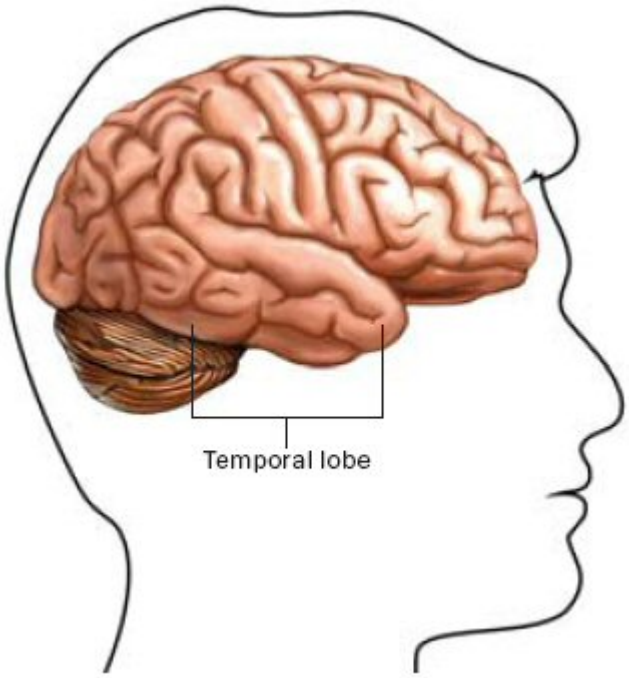

চিত্রঃ মস্তিস্কের টেম্পোরাল লোব : অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন মস্তিস্কের এই অংশটিই হয়ত ধর্মীয় প্রনোদনার মূল

উৎস। এই অংশটি নিয়ে গবেষণা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সাথে এপিলেপ্সীর জোরালো সম্পর্কও পাওয়া গেছে।

এই ধরনের গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যানাডার লরেন্টিয়ান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাইকেল পারসিঙ্গার আরো একধাপ সাহসী গবেষণায় হাত দিলেন। তিনি ভাবলেন, টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক তারতম্য যদি ধর্মীয় প্রণোদনার উৎস হয়েই থাকে তবে, উল্টোভাবে - মস্তিস্কের এই গোদা অংশটিকে উদ্দীপ্ত করেও তো কৃত্রিমভাবে ধর্মীয় প্রনোদনার আবেশ আস্বাদন করা সম্ভব, তাই না? হ্যা, অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে তো তা সম্ভব। ডঃ পারসিঙ্গার ঠিক তাই করলেন। তিনি টেম্পোরাল লোবকে কৃত্রিম্ভাবে উদ্দীপ্ত করে ধর্মীয় আবেশ পাওয়ার জন্য তৈরী করলেন তার বিখ্যাত 'গড হেলমেট'। এই হেলমেট মাথায় পরে বসে থাকলে নাকি 'রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স' আহরণ করা সম্ভব। হেলমেট বানানোর পর অফিশিয়ালি প্রায় ছ'শ জনের উপরে হেলমেট পরিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এদের প্রায় ৮০ শতাংশ বলেছেন, তাদের এক ধরণের অপার্থিব অনুভূতি হয়েছে [৩৩]। তারা অনুভব করেছেন, কোন অশরীরী কেউ (কিংবা কোন স্পিরিট) তাদের উপর নজরদারি করেছে। অনেকের অভিজ্ঞতার লাটাই এর চেয়েও গজখানেক বেশি। যেমন, এক মহিলার হেলমেট পরার পর মনে হয়েছে তিনি তার মৃত মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আরেক মহিলার কাছে এই অশরীরী অস্তিত্ব এতটাই প্রবল ছিল যে, পরীক্ষার শেষে যখন অশরীরী আত্মা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল যে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হেলমেট মাথায় পরার পর ব্রিটিশ সাংবাদিক আয়ান কটনের পুরো সময়টা নিজেকে তীব্রতী ভিক্ষু বলে বিভ্রম হয়েছিল। বিজ্ঞানী সুসান ব্ল্যাকমোরের অভিজ্ঞতাটাই বোধ হয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার। তিনি নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে [৩৪] -

> "আমার হঠাৎ মনে হল কেউ আমার পা ধরে টানছে, দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দিচ্ছে।, তারপর ধাক্কা মেরে আমাকে দেওয়ালে ফেলে দিল। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত; কিন্তু ঘটনাটা ছিল দিনের আলোর মতই পরিস্কার। আমার প্রথমে প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল, পরে রাগের স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করে নিল ভীতি...।"

অধ্যাপক ব্ল্যাকমোর পরে বলেছিলেন [৩৫], 'পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এক কথায় অবিস্মরনীয়। পরে যদি বেরিয়ে আসে কোন প্ল্যাসিবো এফেক্টের কারনে আমি এগুলোর মধ্য দিয়ে গেছি -আমি তাহলে অবাকই হব।'

তবে সবার ক্ষেত্রেই যে 'গড হেলমেট' একই রকমভাবে কাজ করেছে তা কিন্তু নয়। একবার গড হেলমেটের কার্যকারীতা দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সকে। ডকিন্স বিবর্তনবাদে বিষেষজ্ঞ একজন বিজ্ঞানী, পাশাপাশি সব সময়ই ধর্ম, অলৌকিকতা প্রভৃতি বিষয়ে উ□সুক। ধর্মের একজন কঠোর সমালোচক তিনি। নিজেকে কখনোই 'নাস্তিক' হিসেবে পরিচিত করতে পরোয়া করেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কাছে বিভ্রান্তি বা 'ডিলুশন', ধর্মের ব্যাপারটা তার কাছে 'ভাইরাস'। এহেন ব্যক্তিকে হেলমেট পরিয়ে তার মনের মধ্যে কোন ধরণের 'ধর্মীয় ফিলিংস' ঢোকানো যায় কিনা, এ নিয়ে অনেকেই খুব উৎসুক ছিলেন।

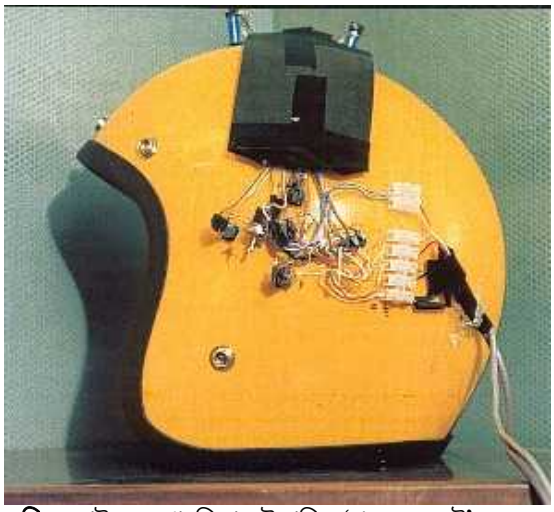

চিত্রঃ মাইকেল পারসিঙ্গার উদ্ভাবিত 'গড হেলমেট'।

রিচার্ড ডকিন্স খুব আগ্রহ ভরেই এই পরীক্ষায় 'গিনিপিগ' হতে রাজী হলেন ২০০৩ সালের । ডকিন্স পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে এসে হেলমেট পরে চেম্বারে ঢুকলেন। যথা সময় বেরিয়েও আসলেন। এসে বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বললেন [৩৫], 'আমি খুবই হতাশ। খুব ইচ্ছে ছিল ঈশ্বর দর্শনের। কিন্তু চেম্বারে বসে মাথা ঝিম ঝিম করার ভাব ছাড়া আর তো কিছু পেলাম না বাপু!'

মনে হচ্ছে ডকিন্সের মত যুক্তিবাদী মাথা মৃগীরোগের জন্য উপযুক্ত নয়। এদের মত লোককে বোধ হয় সহজে গায়েবী আওয়াজ শোনানো, কিংবা দিব্য-দর্শন দেওয়া এত সহজ নয়। কাজেই, দুর্মুখেরা বলবেন, ডকিন্সের মত 'নিরেট-মস্তিস্ক' লোকেরা পয়গম্বর হবার উপযূক্ত নন! ধর্মবাদীরা কি আর সাধে বলে যে, নবুয়ত পেতে যোগ্যতা লাগে - হু!!

কিন্তু রিচার্ড ডকিন্সের উপর কাজ না করলেও এটাও ঠিক সুসান ব্ল্যাকমোর সহ অনেকের মধ্যেই তো করেছে, এবং করেছে খুব ভালভাবেই। তারা নিজেরাই তা স্বীকার করেছেন। আর পারসিঙ্গারের দাবী অনুযায়ী, তার উদ্ভাবিত এ প্রক্রিয়ায় যদি ৮০ শতাংশের বেশী লোকের অপার্থিব অনুভূতি হয়েই থাকে, তবে বলতেই হয় ঈশ্বরানুভূতির মত ব্যাপার স্যাপারগুলো হয়ত মস্তিস্কের বাইরে নয়। পারসিঙ্গারের ভাষায় [৩৪], 'ঈশ্বর মানুষের মস্তিস্ক তৈরি করেনি, বরং মানুষের মস্তিস্কই সৃষ্টি করেছে শক্তিমান ঈশ্বরের।'

শেষ কথা

আত্মা ব্যাপারটি মানুষের আদিমতম কল্পণা । এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে অপার্থিব আত্মার কল্পণা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছারা কিছু নয়। আমার এ প্রবন্ধে আমি খুব বিশদভাবে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আত্মা নামক ধারণাটিকে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। এর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হল -

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর সাথে আত্মা নামক ব্যাপারটি একেবারেই খাপ খায় না। সোজা সাপ্টা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় - আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ বিজ্ঞান পায় নি। আর যত দিন যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আশা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হচ্ছে দূরাশায়। বস্তুতঃ স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। আর সেজন্যই যুগল-সর্পিলের (ডিএনএ) রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন [২], 'একজন আধুনিক স্নায়ু-জীববিজ্ঞানী মানুষের এবং অন্যান্য প্রানীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মা নামক ধর্মীয় ধারণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না'। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন একই ধারণা পোষণ করে বলেছিলেন, 'দেহবিহীন আত্মার ধারনা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন এবং অন্তঃসারশূন্য'।

কাজেই বিজ্ঞান মানতে হলে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কোন যুক্তিনিষ্ঠ কারণ নেই। প্রাচীনকালের মানুষেরা জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে সমাধান করতে না পেরে আশ্রয় করেছিল 'আত্মা' নামক আধ্যাত্মিক ধারণার। বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা সে সমস্ত পুরোণ এবং অসংজ্ঞায়িত ধ্যান ধারনাকে খন্ডন করে দিয়েছে। আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই বিজ্ঞানীরা আজ মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণির আচরণ, আচার-ব্যবহার এবং নিজের 'আমিত্ব' (self) এবং সচেতনতাকে (consciousness) ব্যাখ্যা করতে পারছে। এমনকি খুঁজে পেয়েছে ধর্মীয় অপার্থিব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় উৎস। কাজেই ামার ব্যক্তিগত অভিমত হল- প্রাণের অস্তিত্বকে ব্যখ্যা করার জন্য আত্মা একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা, যেমনি আলোর সঞ্চালনকে ব্যখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের চোখে আজ ইথার একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা। কিন্তু আত্মার সাথে ইথারের পার্থক্য হল - পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ইথারকে হটানো সম্ভব হলেও আত্মাকে হটানো সম্ভব হয়নি, বরং আত্মা নামক পরিত্যক্ত ধারণাটিই আজো সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়। অস্তিত্বহীন আত্মার শান্তির জন্য মানুষ তাই কত কিছুই না করে! আর সাধারণ অসচেতন মানুষকে সম্মোহিত রাখতে এই আগাছার চাষকে পুরোদমে জনপ্রিয় করে রেখেছে তাবৎ ধর্মীয় সংগঠনগুলো, স্বীয় ব্যবসায়িক স্বার্থেই। তবে, এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার দারস্থ হবে না; আত্মার 'পারলৌকিক' শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কিংবা মিলাদ-মাহফিল বা চল্লিশায় অর্থ ব্যয় করবে না, মৃতদেহকে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে বা মাটিচাপা দিয়ে মৃত দেহকে নষ্ট করবে না, বরং কর্ণিয়া, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি অংগ-প্রত্যঙ্গগুলো যেগুলো মানুষের কাজে লাগে, সেগুলো মানবসেবায় দান করে দেবে (গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের একটিমাত্র মৃতদেহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ২২ জন অসুস্থ মানুষ উপকৃত হতে পারে)। এ ছাড়াও মেডিকেলের ছাত্রদের জন্য মৃতদেহ উন্মুক্ত করবে ব্যবহারিকভাবে শরীরবিদ্যাশিক্ষার দুয়ার। আরজ আলী মাতুব্বর তার মৃতদেহ মেডিকেল কলজে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক সময় অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন [৩৬],

> '...আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানব কল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগন শল্যবিদ্যা আয়ত্ব করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে

দিয়েছে মেডিকেলে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা'

সে অনুপ্রেরনায় উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীতে মেডিকেলে নিজ মৃতদেহ দান করেছেন ড. আহমেদ শরীফ, ড. নরেন বিশ্বাস, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ। সদ্য প্রয়াত ইহজাগতিক গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী আমাদের এ তালিকায় নতুন এবং গর্বিত সংযোজন। সমাজ সচেতন ইহজাগতিক এ মানুষগুলোকে জানাই আমার প্রাণের প্রণতি।

অথ্যসূত্র :

1. Elbert, Jerome W, *Are Souls Real?* 2000, Prometheus Books.

2. Crick, Francis, *Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul*, 1995, Scribner.

3. Dennett, Daniel C., *Consciousness Explained*, 1992, Back Bay Books

4. Kurtz, Paul, *Science and Religion: Are They Compatible?*, 2003, Prometheus Books

5. Stenger, Victor J, *God: The Failed Hypothesis. How Science Shows that God Does Not Exist*, 2007, Prometheus Books.

6. Clark, William R, *Sex and the Origins of Death*, 1998, Oxford University Press, USA.

7. Swin, Tony, *A place for Strangers: Towards a history of Australian Aboriginal Being*, 1993, Cambridge University Press.

8. Blackmore, Susan, *Dying to Live: Near-Death Experiences*, 1993, Prometheus Books.

9. Blackmore, Susan, *Consciousness: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (Paperback)*, 2005, Oxford University Press.

10. Pinker, Steven, *How the Mind Works*, 1999, Penguin Books Ltd.

11. Brown, Warren S et. el, *Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature*, 1998, Augsburg Fortress Publishers.

12. Churchland, Patricia S., *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain*, 1989 , The MIT Press

13. Churchland, Paul M, *The Engine of Reason, The Seat of the Soul: A Philosophical Journey into the Brain*, 1996, The MIT Press.

14. Zimmer, Carl, *Soul Made Flesh: The Discovery of the Brain—and How It Changed the World,* 2004, New York: Free Press.

15. Gora, God and Soul, Atheism: Questions and Answers, Atheist Center, Vijayawada.

16. Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.

17. Stone Alex, *Suspended Animation : Is Induced hibernation the key to surviving a trip to the ER?* Discover, May 2007.

18. Bosveld, Jane, Soul Search: Can science ever decipher the secrets of the human soul? Discover, June 2007

19. অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে*, অবসর, ২০০৭।

20. অপরাজিত বসু, *প্রাণের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞান*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৯।

21. প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম ও পঞ্চম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।

22. শহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞানের দর্শন (প্রথম খন্ড), শিক্ষাবার্তা প্রকাশণা, ২০০৫।

23 Rationally speaking, Does the soul weigh 21 grams? March 08, 2007

24. Avijit Roy, *Construction of Physics-based brain atlas and its applications*, PhD thesis, NUS, 2007

25. Roger Penrose, *The Emperor's New Mind*, Oxford University Press, USA; New Paperback edition, 2002.

26. Robert Todd Carroll, *Near-death experience (NDE)*, Skeptic's Dictionary, Last updated 12/03/07, http://skepdic.com/nde.html

27. Susan Blackmore, *Near-Death Experiences: In or out of the body?* Skeptical Inquirer 1991, 16, 34-45.

28. S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. Journal of Near-Death Studies, 8:15-28, 1989.

29. Bressloff, Paul C., Jack D. Cowan, Martin Golubitsky, Peter J. Thomas, and Matthew C. Wiener. *What Geometric Visual Hallucinations Tell Us About the Visual Cortex*., *Neural Computation*. Vol. 14, No. 3, 473-491, 2002

30. John Horgan, The God Experiments : Five researchers take science where it's never gone before, Discover, December, 2006

31. David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind, October/November 2007..

32. V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind, Harper Perennial, 1999.

33. দীক্ষক দ্রাবিড়, *মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান*, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

34. Robert Hercz, *The God Helmet*, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002

35. God helmet, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/God_helmet

36. আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ।

37. বন্যা আহমেদ, *বিবর্তনের পথ ধরে*, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭

38. Steven Laureys, Eyes Open, Brain Shut; May 2007; Scientific American Magazine, May 2007.

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com